প্রথম পার্টি কংগ্রেস: ৪ মার্চ ২০২২

জাতীয় পরিস্থিতি

(National Situation)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
প্রথম পার্টি কংগ্রেস: ৪ মার্চ ২০২২

জাতীয় পরিস্থিতি

(National Situation)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫২২০৬, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫১৩৩৫
ই-মেইল : mail@spb.org.bd

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২২, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : আব্দুর রাজ্জাক রুবেল

মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৬৭৬ ৩১৩৯৫৭ ই-মেইল : press@.gronthik.com

মূল্য : ৫০ টাকা

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রথম কংগ্রেসের প্রতিনিধি অধিবেশনে (২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ অনুষ্ঠিত) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উত্থাপিত জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কিত মূল্যায়নের খসড়া প্রস্তাবের উপর প্রতিনিধিবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা এবং কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক সদস্যদের সভায়ও রিপোর্টের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর তা গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ করে কংগ্রেসের দলিল হিসেবে প্রকাশ ও প্রচারের জন্য অনুমোদিত হয়।

ধন্যবাদান্তে

খালেকুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাসদ

প্রথম পার্টি কংগ্রেস: ৪ মার্চ ২০২২

জাতীয় পরিস্থিতি

(National Situation)

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল — বাসদ এর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে যা ৪ মার্চ, ২০২২ প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে। এই সময় বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন কবলিত দেশের হাল পরিস্থিতি কেমন তা এক কথায় বলতে গেলে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গানের কলি — 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার' এর কথা মনে পড়ে যায়। যে বছরটি আমরা সবেমাত্র পার করলাম, সেই ২০২১ সাল কেমন ছিল তা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিশদে ছাপা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২২ দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টে দেখা যায় ২০২১ সালেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার ১১৮ জন, তার মধ্যে ৩৭ জন সাংবাদিক। পুলিশী হেফাজতে কারান্তরালে মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জন মানুষের। বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে ৮০ জন মানুষকে। ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ১৩২১ নারী, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৪৭ জন। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ৯ জন। যৌন হয়রানিতে পড়েছেন ১২৮ জন। যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন ৭৭ জন পুরুষ। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ৬৪০ জন। পারিবারিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৭২ জন। সালিশ ও ফতোয়ায় নির্যাতনের শিকার হন ১২ জন, ২ জন আত্মহত্যা করেন। গৃহকর্মী নির্যাতিত হয়েছেন ৪৫ জন। এসিডের শিকার ২৩ জন নারী। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী কর্তৃক গুম-অপহরণ, নিখোঁজ হন ৭ জন, এর মধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার দেখানো হলেও ১ জন নিখোঁজ। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে বিক্ষোভ ও সহিংসতায় ১৪ জন নিহত। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ এর গুলিতে ১৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক নিহত। নির্বাচন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হন ২৭০ জন, আহত ১৮,০০০ জন। ২০ বার দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সংবাদে ছিল, হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গোৎসবের অষ্টমীর দিন কুমিল্লার পূজামণ্ডপে কথিত কোরান অবমাননার কথা ছড়িয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পূজামণ্ডপ, মন্দির, ঘরবাড়ি ও দোকানে হামলা — ভাংচুর করা হয়। এসব হামলায় ৯ জন নিহত

হয়। এক বছরে ১০৫৩টি ডাকাতি ও দস্যুতার ঘটনা ঘটে, প্রাণ হারান ১১ জন, আহত হন ৯৯১ জন। খোদ রাজধানীতেই ডাকাতি ও দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে ১৬৮টি। এছাড়াও সর্বক্ষেত্রে অব্যবস্থা-অনিয়ম-দুর্নীতি-অর্থ আত্মসাতের অসংখ্য ঘটনা, নানা দুর্ঘটনায় জীবনহানিসহ বিবেককে পীড়িত, মানবতাকে লাঞ্ছিত করার মতো খবরে ঠাঁসা থাকে গণমাধ্যমসমূহ। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এর সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে দেশে গড়ে দৈনিক ১৮ জন আত্মহত্যা করেন এবং ৬৫ লাখ মানুষ আত্মহত্যার ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে আছেন।

এমনই বিবর্ণ চেহারার বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী মহাসমারোহে পালন করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, উড়াল সড়ক ইত্যাদি দৃশ্যমান অবকাঠামোগত নির্মাণকীর্তি দেখিয়ে উন্নয়নের ডামাডোল আর নেতা-নেত্রীর বন্দনাগীতে মুখরিত করে রাখা হয়েছে দিগ্বিদিক-চারিদিক। ক্ষমতাঘনিষ্ঠ ও সুবিধাভোগীদের সঙ্গতে কোলাহলে গরিষ্ঠ শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের হাহাকার আর ক্রন্দনধ্বনি চাপা পড়ে যাচ্ছে। বিত্তবানদের উল্লাস আর শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দীর্ঘশ্বাস এর এমন পরিস্থিতিতে দেশ জাতি কেন উপনীত হল তার জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সার্বিক জাতীয় পরিস্থিতির একটা আলোচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান পরিসরে এই বিপুল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় আমরা আমাদের কংগ্রেসকে সামনে রেখে একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র ও করণীয় হাজির করতে চাই।

জাতীয় পরিস্থিতি বিচার করতে গেলে প্রথমেই একটা জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠার ইতিহাস, রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও শাসকদের শ্রেণি চরিত্র, শাসন প্রশাসনের নীতি-পদ্ধতিগত অবস্থান, জনচেতনার স্তর ও গণদাবিতে তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তিক্ষমতা, রাজনৈতিক আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি মিলে তার ফলাফলে সার্বিক পরিস্থিতি কোন ধরনের পরিবর্তনে বিবর্তনে কিরূপ দাঁড়াচ্ছে, তার পর্যালোচনা ও পরিমাপ প্রয়োজন।

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে জনযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে। তারপর থেকে এ সময়কালে ক্ষমতার অদল-বদল সত্ত্বেও নানা পোশাকে বুর্জোয়া শ্রেণিই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং আছে। আমরা বিভিন্ন সময় বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন প্রশাসনের স্বরূপ, নীতিগত অবস্থান ও জনজীবন-

সমাজজীবনে কী তার প্রভাব তা নিয়ে আলোচনা করেছি। সর্বহারা শ্রেণির দল হিসেবে আমাদের মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দলীয় এবং যৌথ আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় চলতে চলতে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর আমাদের দল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নানা চড়াই-উৎরাই, আন্দোলন সংগঠনের নানামুখী কর্মকাণ্ডের এক বিস্তর পটভূমি রচিত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত কর্মসূচি নিতে গিয়ে আমরা সাংগঠনিক অনেক ধাপ অতিক্রম করে ২০০৯ সালে কনভেনশন করার পর এখন ২০২২ সালের ৪ মার্চ প্রথম কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। ফলে, কংগ্রেসকে সামনে রেখে আমাদের দলের কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পরিস্থিতির একটা সার সংক্ষেপ জনগণের সামনে তুলে ধরছি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ:

প্রায় ২শ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন, ২৩ বছরের পাকিস্তানি প্রায় উপনিবেশিক শাসন বিরোধী অসংখ্য গণসংগ্রামের, আত্মবলিদানের পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশ। এই যুদ্ধ শুরুর আগেও বাংলাদেশের সমাজ ছিল শ্রেণিতে বিভক্ত। একদিকে আপামর শোষিত জনগণ অন্যদিকে পাকিস্তানি ২২ পরিবারের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারা উঠতি বাঙালি ধনিক শ্রেণি। দুই অবস্থান থেকে এই দুই শ্রেণির মিলন ঘটেছিল এবং একটা মিলিত জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির শক্তি নির্মিত হয়েছিল। জনগণ চেয়েছিল সার্বিক মুক্তি আর উঠতি ধনিক শ্রেণি চেয়েছিল উপনিবেশিক দখলমুক্ত লুটপাটের অবাধ লীলাভূমি। নেতৃত্ব ছিল উঠতি ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দল আওয়ামী লীগের হাতে। ফলে জনগণ দেশ স্বাধীন করলেও স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা ধনিক শ্রেণির দখলে চলে যায়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, '... বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রুপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম ...'। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ

করিয়াছিল — জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;'। এই সবকিছুকে বুলিতে পরিণত করে বুর্জোয়া শ্রেণি বাস্তবে তার বিপরীতমুখে দেশ পরিচালনার নীতি নিয়ে চলতে থাকে। যার ফলাফলে এবং পরিণতিতে জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র বাস্তবে শোষক শ্রেণির কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতায়নের রুপ নিয়েছে। সমাজতন্ত্রকে মুক্তবাজারি পুঁজিবাদী জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নাম জপতে জপতে রাষ্ট্রের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খচিত নামাবলি জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন বিকাশের জাতীয় স্বার্থ চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে নতজানু হয়ে অসম লেনদেনের গাঁটছড়ায় বাঁধা হয়েছে। সাম্যের বাণী বৈষম্যের বিশাল গহ্বরে পতিত। মানবিক মর্যাদা প্রাপ্তি দরিদ্র মানুষদের জন্য বিত্তবান-প্রভাবশালীদের দয়া-করুণার বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে। সামাজিক ন্যায় বিচার সমাজ থেকে উধাও হয়ে ক্ষমতাবানদের দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিধি নিয়মের যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। হতদরিদ্র, দরিদ্র, শ্রমজীবী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, বিভিন্ন জাতিসত্বাসহ দুর্বল জনগোষ্ঠীর স্থায়ী অস্থায়ী নিবাস ও কর্মক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণ করলেই বিচারের বাণীর নিভৃত কান্না শোনা যায়।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল বিদেশি উপনিবেশিক শক্তি বনাম দেশের জনগণ। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তা পরিবর্তিত হয়ে প্রধান দ্বন্দ্ব দাঁড়িয়েছে দেশি বুর্জোয়া বনাম দেশি সর্বহারা। অর্থাৎ শাসক-শোষক বুর্জোয়া শ্রেণি বনাম শোষিত সর্বহারা-শ্রমজীবী জনগণ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে অনেক দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, ভ্রান্তি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রধানত বামপন্থি ধারার রাজনৈতিক গণসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। সেজন্য আদর্শহীনতা, অর্থলোলুপতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি রাজনীতিকে গ্রাস করতে পারেনি। বামপন্থি শক্তির ভুল-ভ্রান্তি এবং শাসকশ্রেণির নির্মম নির্যাতন-আক্রমণে এক পর্যায়ে বাম ধারা পর্যুদস্ত হয়। শাসক শ্রেণির মধ্যকার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে। রাজনীতি থেকে নীতি-আদর্শ দূরে সরতে থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণির গোষ্ঠী বিরোধ ক্রমে ক্রমে সহিংস রূপে আত্মপ্রকাশ করে। গণসংগ্রামের পথ স্থবির হয়ে যায়। তা নাহলে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম অগ্রসর হয়ে গণঅভ্যুত্থান হতে পারতো। কিন্তু বুর্জোয়া গোষ্ঠীবিরোধ নৃশংস সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের নতুন বিভাজনে গোটা জাতিকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনা, বামপন্থা ও সমাজতন্ত্র বিরোধী এক প্রবল আক্রমণ নতুনভাবে নেমে আসে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও কোন কোন ক্ষেত্রে এর সহায়ক হয়েছিল। বুর্জোয়া বনাম বুর্জোয়া গোষ্ঠীবিরোধে দ্বি-দলীয় ক্ষমতা দখল-বদলের প্রক্রিয়া চালু হয়।

এমতাবস্থায় বামপন্থিদের একাংশ সংগ্রাম বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়া গোষ্ঠী বিরোধে শরিক হয়। পরিবারতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র শাসনব্যবস্থায় চেপে বসে। রাজনীতি সেবার বদলে বাণিজ্যের চেহারা নেয়। শোষিত শ্রেণি তথা শ্রমজীবী জনগণ বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে জিম্মি দশায় পতিত হয়। ধনী দরিদ্র বৈষম্য দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। এক বিশাল সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সর্বস্তরে গজিয়ে উঠে। শাসনব্যবস্থার দুর্নীতিগ্রস্ত পৃষ্ঠপোষকতায় তারা পুষ্ট হতে থাকে। এরই পরিণতি ফলাফলে রাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বৃত্তদের হাতে যাওয়া সম্প্রসারিত হয়। পার্লামেন্ট ব্যবসায়ীদের ক্লাবের খ্যাতি পায়। এমনিতেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র এখন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়াজুড়ে প্রশ্নবিদ্ধ। তারা টাকা, প্রচার ও জনগণের অবনমিত চেতনার সুযোগে ভোটের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্র বলে চালায়। বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণি সে সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার হিড়িক এবং দিনের ভোট রাতে সম্পন্ন করার মতো বিষয়ও জনমনে গা সওয়া হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশনের একজন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদারের মতে 'নির্বাচন আইসিইউ (ICU)-তে, গণতন্ত্র লাইফ সাপোর্টে। প্রধান দলগুলোর অসহিষ্ণু মনোভাব দেশে গণতন্ত্রকে অন্তিম অবস্থায় নিয়ে গেছে।' (প্রথম আলো ১৫ নভেম্বর '২১) তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'ইউপি (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে, ওই নির্বাচনে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্রের লাশ পড়ে আছে'। (কালের কণ্ঠ ১৫ ফেব্রুয়ারি, '২২) দেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বলেন, 'হাইকোর্ট বিভাগ এখন আর সাংবিধানিক কোর্ট নেই, এটি ক্রিমিনাল ফৌজদারি কোর্টে কনভার্ট হয়ে গেছে, আমার যাওয়ার সময় এটি সবচেয়ে দুঃখের, কোর্ট আমি যে জায়গায় দেখেছি, সেই জায়গায় নেই।' (প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর '২১) আইনসভার সদস্যদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধার নমুনা দেখা যায় যখন সরকারি দলের একজন সাংসদ ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, 'অনেক সময় বিরোধী দলের নেতারা বলেন আমরা ক্রস ফায়ার দিয়ে মানুষ হত্যা করছি। আমি ক্রস

ফায়ারের পক্ষে, একজন সন্ত্রাসীর কারণে লাখ লাখ মানুষের ঘুম যেখানে হারাম হয়ে যায়, সেই সন্ত্রাসীর সমাজে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।' (প্রথম আলো ১৪ নভেম্বর '২১) বিনা বিচারে মানুষ হত্যার পক্ষে এধরণের কথা আরও অনেকেই হরহামেশা বলেন। গণতান্ত্রিক আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি শাসকদের অবজ্ঞা আর বিচার প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা ও অনিশ্চয়তাজনিত কারণে জনগণের অনাস্থা কোন পর্যায়ে গেলে এ পরিস্থিতি তৈরি হয় তা ভাবা দরকার। তাছাড়াও সমস্ত সাংবিধানিক, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্বাহী শক্তির আনুগত্য ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করতে করতে জবাবদিহিতামূলক দায়বদ্ধ জনসেবার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। আমলা-কর্মচারীরা গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারীর বদলে অনেকটা শাসকদলের কামলাখাটা কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে। ব্যতিক্রম যতটুকু আছে তা কোনঠাসা হয়ে আছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে শাসকদলের লাঠিয়াল বাহিনীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে।

শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তার করেছে। ক্ষমতাধর দুর্নীতিবাজ লুটপাটচক্র, প্রশাসন ও পুলিশ এই তিন মিলিত সিণ্ডিকেটের হাতে রাজনীতি জিম্মি। শাসক দলের একজন রাজনীতিবিদ ময়মনসিংহ-৩ আসনের ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ জাতীয় সংসদে ১৭ জানুয়ারি ২০২২ বলেছেন, 'এমপি হিসেবে একজন সচিবের কাছে গেলে তারা যেভাবে শ্রদ্ধা করবেন, সেই শ্রদ্ধাবোধ নাই। পিয়ন পর্যন্ত আমাদের দাম দেয় না। স্যারডা না বইলা পারে না। আমলাতন্ত্রের হাতে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি।' আরও অনেক সাংসদকেও পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এ ধরণের ক্ষোভ ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। তবে জনগণকে বাদ দিয়ে আমলা পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা রক্ষা করা ও বিরোধী শক্তিসমূহকে দমন করার আনন্দ যে এক সময় বিষাদে পরিণত হতে পারে তার কার্যকারণও এদের ভেবে দেখার সময় হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়ায় এখন শাসন চলছে। শাসন-শোষণকে অব্যাহত রাখতে দমনমূলক আইন ও ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

পাশাপাশি রাজনীতির আসল সংজ্ঞাকেই পালটে ফেলা হয়েছে। গ্রাম্য কোন্দলকে ভিলেজ পলিটিক্স বলা হয়, শিক্ষক দলাদলিকে টিচার্স ক্লিক-

কোটারি না বলে টিচার্স পলিটিক্স বলা হয়। এরকম আরও অনেক নোংরা দলাদলি, কূটকৌশলে স্বার্থ উদ্ধার ও অন্যকে হেনস্তা-ঘায়েল করার প্রক্রিয়াকেই রাজনীতি বলে অখ্যায়িত করা হচ্ছে। আসলে কোন নীতি এবং আদর্শের দ্বারা রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করার এবং সেই ভিত্তিতে দল গঠন ও পরিচালনা করা, জনমত সংগঠিত করা ও জনগণকে সম্পৃক্ত করার নামই হল রাজনীতি। রাজনীতি সমাজ পরিচালনার প্রধান শক্তি। ইঞ্জিনের মতো সমাজও বগিকে টেনে চলে রাজনীতি। তবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণি উর্ধ্বে তা পরিচালিত হয় না। সামন্ত ব্যবস্থা উচ্ছেদের এবং আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠনের লগ্নে বুর্জোয়াশ্রেণি সাম্য, গণতন্ত্র, ইহজাগতিকতা, নারীমুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যাদি মিলে যে জাতীয়তাবাদী-মানবতাবাদী ভাবাদর্শের জয়গান করত আজ তার নমুনা আবিষ্কার করাও কঠিন হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। কিছু ঐতিহ্য ও প্রথাগত ব্যতিক্রম ছাড়া গণতন্ত্রের স্বরূপ আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ সর্বত্রই প্রায় একই সমান্তরালে এসে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত নির্বাচনে রাখঢাক করা অনেক কিছুই খোলামেলা প্রকাশ পেয়েছে। সেখানকার ভোটকেন্দ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া খুবই জটিল। তাছাড়া ৯৯ ভাগ মানুষের সম্পদ এক ভাগ মানুষের হাতে জমা হওয়া সমাজে তাকে ডিঙ্গিয়ে মুক্ত জনমত গঠন ও ভোট বাক্সে একত্রীকরণ আরও কঠিন। দুই আড়াইশো বছরের গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তনকারীদের সামরিক বলপ্রয়োগ চেষ্টা, আইনি ফাঁকফোকর খোঁজা, জবরদস্তিতে রাজধানী কেন্দ্র আমেরিকার পার্লামেন্ট (ক্যাপিট্যাল হিল) দখল ও ভোটের ফলাফল বদলে দেয়ার লক্ষ্যে সংঘাত সংঘর্ষ হানাহানি খুনখারাবি পর্যন্ত বিশ্ববাসী দেখেছে। খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে হাত রেখে শপথ নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালকেরা কতটা সেক্যুলারিজম রক্ষা করেন তা বলা বাহুল্য। অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে কতটা নিজের স্বাধীনতার মান মর্যাদা রক্ষা পায় তার হিসেবও তাদের কাছ থেকে মেলা ভার। কারণ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের শ্রেণিচরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বাইরে গিয়ে কারো পক্ষেই শাসন-প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের শাসকশ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনা ও গণআকাঙ্ক্ষা পরিহার করে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের দেখানো শেখানো পথে চলতে গিয়ে আজ রাজনীতিকে এতটাই গণবিরোধী ও কলুষিত করেছে যে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, সংঘাত-সহিংসতা থেকে বেরোবার উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছে না। ৫০ বছর ধরে তারা গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে সামরিক বেসামরিক স্বৈরতান্ত্রিক

শাসনের দোলায় দোল খেয়েছে। নির্বংশীকরণ আর নিঃশেষীকরণের পথে ক্ষমতাদখল আর ক্ষমতা রক্ষার সহিংসতায় মত্ত থেকেছে। প্রধান দুই বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল এখন আর জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করছে না। ভোটের রায় ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দল ও গোষ্ঠীর বিপক্ষে গেলেও ক্ষমতা ছেড়ে দেয়াকে সম্পদ আর জীবনের ঝুঁকি মনে করে তারা ক্ষমতা ছাড়তে পারছে না, আর জনগণের রায় পক্ষে না গেলে বা রাজনৈতিক চালে কৌশলে হেরে গিয়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকাকে প্রধান বিরোধী বুর্জোয়া দল ও গোষ্ঠী তাদের সাংগঠনিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য মনে করছে। ফলে ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে ক্ষমতাসীনদের ভোটে নয়-ছয় করা, জাল-জালিয়াতির নানা ফন্দি-ফিকির বের করা, রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক সংস্থাকে ব্যবহার করে যেভাবেই হোক ক্ষমতা আকড়ে থাকতে গিয়ে ভোটার ছাড়া নির্বাচন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন, দিনের ভোটের অর্ধেক কাজ রাতে সেরে রাখার নির্বাচন ইত্যাদি করে এখন গণ অনাস্থা ও গণরোষে পড়তে হয়েছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিরোধী বুর্জোয়া পক্ষও ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে। তাই এখন বুর্জোয়া শ্রেণির গড় স্বার্থে দেশি-বিদেশি পরামর্শে গণতন্ত্র ও নির্বাচনী ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বারে বারে লাঠি ভেঙেছে, সাপ মরেনি। এখন নির্বাচন কমিশন মেরামত ও শুদ্ধ করার তোড়জোড় চলছে। সংবিধানের ১১৮(১) এ নির্বাচন কমিশন গঠন প্রসঙ্গে বলা আছে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপ্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।' আইনের বিধানাবলির কথা থাকলেও গত ৫০ বছরে এই আইনটি কোন সরকারই করেনি। নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনের ফলাফলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার মনোভাব থেকেই যে আইন প্রণয়নে শাসকশ্রেণির উদাসীনতা ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। সামরিক-বেসামরিক শাসনামলের নির্বাচন, দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসমূহের সার্বিক অভিজ্ঞতা থেকে নির্বাচন কমিশন আইনের দাবি উঠে এবং দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রসঙ্গটিও জোরালোভাবে রয়েছে। বুর্জোয়া প্রধান দলগুলি একে অপরকে বিশ্বাস না করায় এবং দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে জনমনে সৃষ্ট অনাস্থার কারণে ১৯৯০ সালের সামরিক

শাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পর তদারকি বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়টি স্বীকৃতি পায়। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত হয়ে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। তারপর নিবন্ধিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নানা অংশের ব্যক্তিবর্গকে ডেকে লোকদেখানো অনুসন্ধান কমিটি (সার্চ কমিটি)-র মাধ্যমে প্রস্তাবিত নাম সংগ্রহ করে নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দমতো ব্যক্তিদের নিয়ে দুই দফায় দুইটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। একটি রকিব কমিশন আর একটি হুদা কমিশন। তারা মুক্ত ও স্বাধীন মত প্রকাশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করে কলঙ্কের রেকর্ড স্থাপন করে। রকিব কমিশনের অধীনে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিনা ভোটে সংসদে ১৫৩ জন নির্বাচিত হওয়া অর্থাৎ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাওয়া এবং হুদা কমিশনের অধীনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে সেরে ফেলার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তাই নির্বাচন কমিশন গঠনের আইন তৈরির চাপ তৈরি হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি '২২ হুদা কমিশনের কার্যকাল মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন কমিশন তৈরি করতে হবে। শাসক দল পুরোনো কায়দায় কমিশন গঠনের চেষ্টা চালায়। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অধিকাংশকে সংলাপে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা এ অর্থহীন সংলাপের প্রয়োজনীয়তা নেই জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বরাবর চিঠি দিয়ে আমাদের অংশগ্রহণে অপারগতা ও যুক্তি তুলে ধরি। আরও অনেক দল সংলাপ বর্জন করে।

আমাদের দাবি ছিল সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ মহল ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জনগ্রাহ্য একটি নির্বাচন কমিশন আইন তৈরি করার। কিন্তু সরকার প্রথমে স্বল্প সময়ে আইন তৈরি সম্ভব নয় বলতে বলতে হঠাৎ তড়িঘড়ি করে একতরফাভাবে আইনের খসড়া করে এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নেয়। এতে নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি অতীত অভিজ্ঞতাসৃষ্ট গণ-অনাস্থা তো কাটেইনি বরং নতুন করে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি করেছে। একে নতুন বোতলে পুরোনো মদ রাখার ব্যবস্থা বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। এই আইনটি অসম্পূর্ণ। কারণ এই আইনে নির্বাচন কমিশনের স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোগত বিন্যাস, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য

এক নির্বাচন থেকে অন্য নির্বাচনের সময়কালব্যাপী সার্বিক প্রয়োজনীয় তৎপরতা, নির্বাচনকালীন সময়ে যতটুকু প্রশাসনিক সহায়তা যাদের কাছ থেকে কমিশন নেবে, নির্বাচনী বিধিবিধান লংঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা, নির্বাচনী মামলা সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে ফয়সালার বাধ্যবাধকতামূলক বিধান, এসব কিছুই স্পষ্ট করা নাই। তাছাড়া নির্বাচনকালে সংসদীয় এলাকায় রিটার্নিং অফিসার এবং ভোট কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার যারা সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকুরিরত তাদের রায়ই যেহেতু চূড়ান্ত ফলে এক্ষেত্রে কমিশনের কী করার ক্ষমতা আছে তাও স্পষ্ট করা হয় নাই। এ ছাড়া সংবিধানের ১১৯(১) অনুযায়ী বর্তমানে নির্বাচন কমিশন শুধু 'রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান' ও 'সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের' জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কিন্তু কথিত স্থানীয় সরকার নামক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার কমিশনের হাতে দেয়া হয়নি। সিদ্ধান্ত নেয় সরকার তারপর নির্বাচন কমিশন যুক্ত হয়। এ বিধান বাতিল করে দেশের জনপ্রতিনিধিত্বের সকল স্তরের নির্বাচন সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করতে কমিশনের হাতে দায়িত্ব দেয়া দরকার যা আজও হয়নি। নির্বাচনের জন্য যাদের অযোগ্য ঘোষণা করা দরকার —যেমন, ঋণখেলাপি, ঋণ অবলোপনকারী, বিদেশে টাকা পাচারকারী, সম্পদের হিসেব দিতে না পারা অনুপার্জিত সম্পদের মালিক, দ্বৈত নাগরিক, সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে সংঘর্ষে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তি, অতীতের কোন নির্বাচনকালে জালজালিয়াতি, সহিংসতা কাজে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তি, নির্বাচনে জিতে জনপ্রতিনিধিত্বকালীন সময়ে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে অসদুপায়ে সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তি ইত্যাদি — সে সকল বিষয়ে কমিশনের ক্ষমতা কতটুকু থাকবে তাও সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। আবার এদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার বিধানাবলি কী হবে তাও আলোচনায় নেই।

সরকারের নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের জন্য আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায়ের আগে বরখাস্ত করা যাবে না ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ছিল যা গুরুত্ব পায়নি। তাছাড়াও নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা কী হবে, প্রচলিত সংসদীয় নির্বাচন পদ্ধতির বদলে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি চালু করা — অর্থাৎ যে দল যতো

শতাংশ ভোট পাবে সে অনুপাতে সে দলের সাংসদ নির্বাচিত হবে, ইত্যাদি বিষয়গুলোও আলোচনায় ছিল কিন্তু গ্রাহ্য করা হয়নি। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থাও বিবেচনায় আসেনি। আমলাতন্ত্র ও পুলিশ প্রশাসনকে শাসকদলের ও সরকারের কাজে ব্যবহারের বদলে আইনানুগ আপেক্ষিক নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের জায়গায় আনার জন্য বড় ধরনের সংস্কার চিন্তাও আমলে নেয়া হয়নি। ফলে আগামী নির্বাচনও যে সুষ্ঠু হবে, জনমতের প্রতিফলন ঘটবে তা জনমনে ঠাঁই পাচ্ছে না। বড় জোর একতরফা ভোগদখলের বদলে গোপন ভাগাভাগির হিসেব নিকাশ কিংবা নতুন কোন কারিকুরি হওয়ার আশংকাই থেকে যাচ্ছে।

এরই মাঝে নতুন আরেক সংকট এসে হাজির হয়েছে। বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণির অভ্যন্তরীণ বিবাদ-কোন্দল বিশেষ করে প্রধান দুই বুর্জোয়া দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মধ্যে অমীমাংসিত বাঁচা-মরা বিরোধ চরমে পৌঁছেছে। আওয়ামী লীগ তাদের জোট নিয়ে টানা প্রায় ১৩ বছর ক্ষমতায় থেকে ধনিক তোষণ ও গণপিষণ নীতিতে চলার কারণে ব্যাপক গণঅসন্তোষে পড়েছে। এই সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের চীন ঠেকানো নীতি ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব সম্প্রসারণ, জোট বাড়িয়ে ঘাটি গেঁড়ে ইন্দো-প্যাসিফিক সাগর বাণিজ্য ও তদারকির স্বার্থে নতজানুদের আরও নত করার চাপে ফেলেছে। নানা অন্যায্য সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে সুরক্ষা দেয়াল ভেবে বর্তমান শাসকগোষ্ঠি এতদিন নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ভারতকে পাশ কাটিয়ে বা তাদের নীরব সম্মতিতে আমেরিকা যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে তা ধারণা করে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার। পুলিশ প্রধান ও র‍্যাব এর ৭ কর্মকর্তার উপর বিধিনিষেধ (স্যাংশন) জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সাবেক সামরিক বাহিনী প্রধানের মার্কিন ভিসা বাতিল করেছে। আরও এগুবে শোনা যায়। সরকার ও সরকারি দল দেন-দরবার ও নানা সন্তুষ্টিকরণ পদক্ষেপ নিয়ে তা ঠেকাতে চাইছে। এর মধ্যে চলছে দুই প্রধান বুর্জোয়া দলের বিতর্ক। কে কতো বেশি তদবির (লবিষ্ট নিয়োগ) অতীতে করেছে, কার তদবির দেশের স্বার্থে আর কার তদবির কতোটা দেশবিরোধী ইত্যাদি। তদবিরে কে কতোটা সফল, কে কতোটা ব্যর্থ হিসেব নিকাশ চলছে। এরা দেশের মাটি ও জনশক্তির উপর নির্ভর করার চেয়েও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বজোড়া শৃঙ্খল দড়িতে ঝুলে থাকতে বেশি পছন্দ করে। কারণ তেলা মাথায় তেল

ঢালা পুঁজিবাদী নীতিতে জনগণের উপর শোষণ চালিয়ে সেই জনগণকে প্রতারণা করা যায় কিন্তু তাদের উপর নির্ভর করা যায় না। তাই শোষণ বৈষম্য যত বাড়ে তত সাধারণ জনগণ ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। শোষণের বরপুত্ররা ক্ষমতাকেন্দ্রে ঘনিষ্ঠ হয়। দেশি-বিদেশি লুটেরাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠে আবার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদও বাঁধে।

মার্কিনিরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন দেশের উপর অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করার পন্থা বরাবর নিয়ে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় বুর্জোয়া বা শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই এই সমস্ত দেশগুলোর কাছে প্রধান বিবেচ্য হওয়ায় তারা মার্কিনি বিধিনিষেধে কাহিল হয়ে পড়লে দেন-দরবার-তদবিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভিন্ন চিত্রও আমরা দেখতে পাই। যেমন আমরা দেখি আমেরিকার কোল ঘেষা কিউবাকে তদবির করতে হয় না। ৬০ বছরের অধিক সময় অবরোধে থেকেও মাথা নোয়াতে হয় না। কারণ কিউবা সমাজতন্ত্রের শক্তি তথা সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী জনশক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ও গণআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমাদেরও সেখানে যাওয়ার ও থাকার কথা ছিল। কিন্তু ইতিহাস বলে বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে ও শোষণমূলক ব্যবস্থায় তা হবার নয়। এই বুর্জোয়ারা শুধু বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছেই নতজানু-আপসকামী হয় না, সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসহ সকল প্রতিক্রিয়ার সাথেই আপস আতাঁত করে চলে। জনগণ যে শক্তিকে পরাস্ত করে এরা সেই শক্তিকে পুনর্বাসিত করে। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ও ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তির পুনর্বাসন তো দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামের সাথে ক্ষমতার স্বার্থে বিএনপি যেমন আতাঁত করে তাদের ক্ষমতার ভাগীদার করে, তেমনি ভিন্ন অবস্থানের একই গোত্রীয় খেলাফতে মজলিস ও হেফাজতে ইসলাম এর সঙ্গে আওয়ামী লীগ আতাঁত করে, চুক্তি করে। তাদের স্বাধীনতার মর্মচেতনাবিরোধী ও গণতান্ত্রিক নীতি-আদর্শবিরোধী দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে। জামায়াতে ইসলামকে খুশি করতে গিয়ে বিএনপি ধর্মনিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলে আর হেফাজতে ইসলামকে ভোটের কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নারী নীতি সংশোধন করে এবং পাঠ্যপুস্তক থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, হুমায়ুন আজাদ, জীবনানন্দ দাসসহ অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিদের লেখা বাদ দিয়ে দেয়। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক সমন্বয় সাধনের

জন্য ধর্ম ফাউন্ডেশন না করে ইসলামী ফাউন্ডেশন করা, সংবিধানের মাথায় বিসমিল্লাহ বসানো ও ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম করা এবং একযোগে সবগুলি রক্ষা করা, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার তথা ধর্মীয় প্রতারণা ছাড়া আর কী হতে পারে। এইভাবে ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে, ধর্মীয় কূপমন্ডুকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে, জনমনে পিছিয়ে পড়া ধর্মীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে বুর্জোয়া শ্রেণি জনগণের চেতনাকে নিম্নগামী করছে। রাজনীতিতে আদর্শবাদিতা, যুক্তি, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সত্যিকার দেশপ্রেম, প্রগতিশীলতা মার খাচ্ছে। তারা জানে জনগণের চেতনার মান নামানো ছাড়া গণবিরোধী শাসন বহাল রাখা যায় না।

ফলে জনগণের চেতনা যতো নিম্নগামী করা হচ্ছে, রাজনীতি ততোটা নিচে নামছে। সংস্কৃতির পতন ঘটছে। জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র চর্চা, ক্ষমতাধর শাসকশ্রেণির ক্ষমতা চর্চায় পরিণত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ছাড়া তাদের বাছাই করা কিছু নমুনা প্রদর্শন পরিস্থিতির বদল ঘটাতে পারবে না। যে কারণে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামাকে রাষ্ট্রপতি বানিয়েও বর্ণবাদী সহিংসতা রোধ করা যাচ্ছে না। ভারতে মুসলমান এপিজে আবুল কালামকে রাষ্ট্রপতি করেও হিন্দুত্ববাদী উন্মাদনার হাত থেকে শাসন প্রশাসনকে মুক্ত করা যায়নি। বাংলাদেশে পালাক্রমে নারী প্রধানমন্ত্রী ও নানা বড় পদে পদায়ন সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূল সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা যায়নি, সমাজ থেকে নারী নিপীড়ন-নির্যাতন রোধ করা যাচ্ছে না। তাই বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে কোথাও কলুষমুক্ত নির্মল মানবমিলনের তথা পারস্পরিক সহযোগিতার সমতা-সাম্যের সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়, সমাজে, জনমনে গণতান্ত্রিক বিজ্ঞানমনস্ক অগ্রসর চেতনা কিংবা উন্নত প্রগতিশীল সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের সার্বিক মঙ্গলবিধান ও সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশের প্রেক্ষিতে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য অনুধাবন সম্ভব যদি আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র যতদিন ছিল তখনকার বেকার, ভিক্ষুক, পতিতামুক্ত রাশিয়া আর আজকের রাশিয়ার দিকে তাকাই। আবার সমাজতন্ত্রের শরীরে পুঁজিবাদের বীজ ঢুকালে তা যে কালক্রমে ভেঙে পড়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৫৬ থেকে ১৯৯০ এ সংশোধনবাদের পথে যাত্রা ও প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান এর শিক্ষা থেকে তাও পরিষ্কার হচ্ছে। আমাদের

দেশ পুঁজিবাদের পথে চলতে গিয়ে স্বাধীনতাত্তোর সময়ে প্রথমে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা থেকে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা থেকে একদলীয় ব্যবস্থা, সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসনের গায়ে বহুদলীয় ব্যবস্থার লেবাস পরানো, আবার সামরিক অভ্যুত্থান ও সকল প্রকার শাসন প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সামরিকীকরণ চেষ্টা, গণঅভ্যুত্থান, নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পত্তন, পার্লামেন্টারি শাসন ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থার শাসন, সামরিক হস্তক্ষেপে ১/১১-র সেনা নিয়ন্ত্রিত বেসামরিক শাসন, ৩য় দফার তদারকি ব্যবস্থায় নির্বাচন, বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে এক দলীয় শাসনে পরিণতি লাভ, তদারকি ব্যবস্থা বাতিল, পুনরায় ঘনীভূত রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিয়েছে। সর্বনিম্ন পর্যায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এখন চর দখলের সশস্ত্র লড়াইয়ের চেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এবছরের নির্বাচনের সাত ধাপে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ১৪০ জন। এ কি জনসেবার নমুনা! অর্থ বিত্ত ক্ষমতার মদমত্ততা, আদর্শ বর্জিত ভোগবাদিতার চরম পরাকাষ্ঠা চলছে রাজনীতির নামে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশকে পরিচালিত করার ফলাফলেই এই রাজনৈতিক দশা দাঁড়িয়েছে। ভূমিতে ভূকম্পন হলে ছাদ যেমন স্থির থাকে না তেমনি দশা। বুর্জোয়া রাজনীতির পুঁজিবাদী অর্থনীতিই এহাল সৃষ্টি করেছে এবং একে চরমে নিয়ে চলেছে। ইট-কাঠ-পাথরের উন্নয়নের দোহাই দিয়ে এ অবস্থার মোড় ফেরানো যাবে না। এর জন্য অর্থনীতির চেহারাটা বুঝা দরকার।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি:

অর্থনীতি হল সমাজের ভিত্তি আর রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি তার উপরিকাঠামো। ফলে দেশের আর্থিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশে যদি পুঁজিবাদী আর্থিক নিয়ম চালু থাকে তবে তার উপরিকাঠামো রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ একভাবে গড়ে ওঠে, আর যদি সাম্য সমাজতন্ত্রের আর্থিক নীতি কার্যকর থাকে তাহলে উপরিকাঠামোর সবক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া, ধরণ-ধারণ ভিন্ন রূপ লাভ করে। বিশাল শক্তি সম্পদের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অতি নিকট প্রতিবেশী ক্ষুদ্র সামর্থ্যের কিউবাকে দেখলে বিচার বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হয়। অতি প্রাচুর্যের মার্কিন দেশে ৯৯ ভাগ বনাম ১ ভাগ মানুষের আন্দোলন

হয়, কারণ সেখানে জীবনধারণের অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় ডলারের হিসেবে আর তুলনামূলক দরিদ্র কিউবাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সেবা বিনামূল্যে সকল নাগরিকের জন্য দেয়া সম্ভব হয়।

আমাদের দেশের আর্থিক নীতি চলছে দশজনের পকেট কেটে এক জনের পকেট ভরার নীতিতে অর্থাৎ পুঁজিবাদী নীতিতে। শোষণকে বৈধতা দেয়ার নীতিতে। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত ক'রে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে — কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" অথচ এখন দেশে চলছে মুক্তবাজারি পুঁজিবাদী অর্থনীতি যা সংবিধানের এই ঘোষণার পরিপন্থি ও সাংঘর্ষিক। মালিকানার নীতি প্রসঙ্গে ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে, "উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে — (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রীয় ও সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; ..." তারপর ২ নম্বরে সমবায় মালিকানা ও ৩ নম্বরে "ব্যক্তি মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা।" এখন তা সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানা খাতই প্রধান খাত। স্বাধীনতার পর প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়ায় ২৫ লাখ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকার সিলিং প্রত্যাহার হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট মোশতাক সরকার ক্ষমতায় বসেই তা ১০ কোটিতে নেয়ার ঘোষণা দেয়। পরবর্তীতে চলতে চলতে রাষ্ট্রখাত অদৃশ্য হওয়ার পথে। যতটুকু বাকি আছে তা শাসকশ্রেণি লুটতরাজের সামগ্রী বানিয়ে লোকসানী খাতে দেখিয়ে এক পর্যায়ে ব্যক্তিমালিকের হাতে তুলে দিচ্ছে। এইভাবে সম্পদের মালিকানার চালচিত্র জুড়ে দানবীয় আকৃতিতে উপস্থিত হয়েছে ব্যাক্তিখাত। শুধু করোনাকালে দেড় বছরে নতুন কোটিপতি হয়েছেন ১৭ হাজার ২৯৩ জন আর একই সময়কালে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ মানুষ নতুনভাবে দরিদ্র হয়েছে, বর্তমানে নতুন-পুরোনো মিলে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৬

কোটি ৮০ লক্ষ (২৬ ডিসেম্বর ২০২১, বাংলা ট্রিবিউন এবং ৪ নভেম্বর ২০২১, প্রথম আলো)। আয়বৈষম্যের এই নগ্ন দৃশ্য একদিকে উন্মোচিত হচ্ছে, আরেকদিকে গত ৮ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২৫৯১ ডলার অর্থাৎ ২ লক্ষ ২২ হাজার ৮২৬ টাকা (প্রতি ডলার ৮৬ টাকা হিসেবে)। এই হিসেব অনুযায়ী ৫ সদস্যের পরিবারের মোট আয় দাঁড়ায় ১২৯৫৫ ডলার অর্থাৎ ১১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৫২ টাকা। ৩ কোটি পরিবারের ১৫ কোটি মানুষের সাথে এই হিসেব কি মিলানো যাবে? এটা অনেকটা শুভঙ্করের ফাঁকির মতো। একজনের আয় ৯৯ লক্ষ টাকা আর একজনের ১ লক্ষ টাকা। তাহলে গড়ে দুজনেই ৫০ লক্ষ টাকার মালিক হিসেবে গণ্য হলেন। এ কারণে পৃথিবীজুড়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরাও আজ একথা স্বীকার করে যে এই মাথাপিছু আয় দিয়ে আর মানুষের জীবন মানের অবস্থা পরিমাপ করা যায় না। সমাজের মুষ্টিমেয় একদল মানুষের আয় বছরে শত কোটি টাকা আর বিশাল অংশের মানুষের খাবারের সংস্থান করাই দুঃসাধ্য। তাই গড় করে পাওয়া এই মাথাপিছু আয় বুর্জোয়াদের ধন বৈষম্য চিত্র আড়াল করা ছাড়া আর কিছু নয়। একইভাবে জিডিপি বা প্রবৃদ্ধির হার দিয়েও দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র পাওয়া যায় না। দেশে একদল মানুষের হাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হয়েছে যে তার সঞ্চালনের মাধ্যমে এবং বিশাল বিশাল মেগা প্রকল্পের দুর্নীতি লুটপাটের মাধ্যমে যে প্রবৃদ্ধি হয় তা কখনো সমগ্র জনগণের জীবনমানের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। একসময় উন্নয়ন অর্থনীতিবিদেরা মনে করতেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি মানেই উন্নয়ন। অনেকেই বলতেন, প্রবৃদ্ধি যত বাড়বে, তত এর সুফল গড়িয়ে ওপর থেকে নিচের দিকের মানুষের কাছে যাবে। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরও আয় বাড়বে। অর্থনীতির ভাষায় ধারণাটিকে বলা হয় 'ট্রিকল ডাউন থিওরি'। তবে উন্নয়নের এ ধারণা বেশ আগেই পরিত্যাগ করেছেন অর্থনীতিবিদেরা। কারণ বাস্তবে দেখা যায়, প্রবৃদ্ধি যত বাড়ে, আয়বৈষম্য বাড়ে তার চেয়ে বেশি। আর তাই জিডিপি প্রবৃদ্ধি মানেই যে অর্থনীতির উন্নতি নয়, সেই ফয়সালাও হয়ে গেছে এত দিনে। এমনকি প্রবৃদ্ধি বাড়লে এর ছিটেফোঁটা চুঁইয়ে নিচে নামার যে 'ট্রিকল ডাউন' নীতি, সেটাও ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তবে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদেরা জিডিপিকে পরিত্যাগ করলেও অনেক রাষ্ট্র ও সরকার কিন্তু এখনো জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে খুবই ভালোবাসে। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের যে জিডিপি নিয়ে আগ্রহ

একটু বেশি, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এর পেছনে অবশ্য কিছু কারণ আছে। যেমন, প্রবৃদ্ধির সঙ্গে একটি দেশের শাসকদের আর্থিক উন্নতি ও ভাবমূর্তির সম্পর্ক রয়েছে। প্রবৃদ্ধি বাড়লে একটি দেশের ভাবমূর্তি বাড়ে বলে মনে করা হয়। দেশটির প্রতি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও আকৃষ্ট করা যায়। ফলে, সরকারের জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি ও কৃতিত্বও বাড়ে। এককথায় এর একধরনের রাজনৈতিক মূল্য আছে। আর তাই সরকারও জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করে জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে থাকে। কোনো কোনো রাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা এতটাই প্রবল যে তারা পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচে জিডিপি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর চেষ্টা করে। ক্ষুধার্ত জনগণকে প্রতারিত ও মোহগ্রস্ত করার কাজটিও এর ফলে সহজ হয়।

জিডিপি একটি বছরে কতটা গাড়ি উৎপাদন করা হলো, সেটি হিসেবে নেয়, কিন্তু এটি গ্যাস নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশের কতটা ক্ষতি করল, সেই হিসেব করে না। এটি বছরে কত টাকার কোমল পানীয় বিক্রি হলো, সেটা হিসেবে নেয়, কিন্তু এ কোমল পানীয় পানের ফলে জনগণের শারীরিক যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হচ্ছে, সেটা হিসেব করে না। এটি নতুন নির্মাণকৃত দালানের মূল্যকে আমলে নেয়, কিন্তু এর ফলে বনজঙ্গল প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে কি না, তা আমলে নেয় না। পরিবেশের যে মারাত্মক ক্ষতি আমরা করছি, তার কোনো প্রতিফলন জিডিপিতে থাকে না। আর তাই তো চোখধাঁধানো প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজধানী ঢাকা বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহরের একটি। আর আমরা বিশ্বের অন্যতম দূষিত দেশের মধ্যে একটি। দেশের বায়ুদূষণ বেড়ে গেছে অনেক। ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিলের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ঢাকার স্কোর ছিল ৪৮৯, যা 'মারাত্মক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জিডিপি ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদের বৈষম্য বুঝতে পারে না। প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়বৈষম্য বেড়ে চলছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'সর্বশেষ খানার আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬' শীর্ষক জরিপে দেখা যায়, দেশের ১০ শতাংশ শীর্ষ ধনীর কাছে মোট আয়ের ৩৮ শতাংশ কুক্ষিগত আছে। অন্যদিকে, ১০ শতাংশ সবচেয়ে গরিবের কাছে আছে দেশের মোট আয়ের ১ শতাংশ। প্রতি বছর উচ্চ ধনীদের আয় বাড়ছে, দরিদ্র-অতিদরিদ্রদের আয় কমছে।

শ্রমিক শোষণ, কৃষক লুণ্ঠন, বাজার সিন্ডিকেট এর কারণে অসম উন্নয়ন ও বিপুল বৈষম্যের দেশে পরিণত হয়েছে। বৈষম্য পরিমাপের দুটি সূচক 'গিনি (Gini) সহগ' ও 'পালমা সূচক' দুই ক্ষেত্রেই দেশে চরম বৈষম্য বিরাজ করছে। অতি গরিব মানুষের সংখ্যায় বাংলাদেশ পৃথিবীতে পঞ্চম হলেও ওয়েলথ-এক্স (Wealth-X)-এর 'এ ডিকেড অফ ওয়েলথ' প্রতিবেদনে এক দশকে ধনকুবের (৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ) বৃদ্ধির হারে বিশ্বের সব দেশকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ শীর্ষে (১৪.৩ শতাংশ)।

দেশ থেকে অস্বাভাবিক হারে টাকা পাচার বেড়েছে। ৬ বছরে দেশের চার লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা (৪৯৬৫ কোটি ডলার) বিদেশে পাচার হয়েছে। এ হিসেবে প্রতি বছর গড়ে পাচার হচ্ছে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১৫ সালেই পাচার হয়েছে এক লাখ কোটি টাকার বেশি। এ সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ১৮ শতাংশই ছিল ভুয়া। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'-র (জিএফআই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। শুধু এক বছরের পাচার করা অর্থ দিয়েই তিনটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। (যুগান্তর, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১) গত ১৬ বছরে দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে অন্তত ১১ লাখ কোটি টাকা বলেও সংস্থাটি জানিয়েছে। (৬ জুলাই, ২০২১, কালের কণ্ঠ) উপনিবেশিক পাকিস্তানি আমলে পাকিস্তানের ২২ পরিবার আমাদের দেশ লুট করে তাদের দেশে নিয়ে যেত। এখন আমাদের স্বাধীন দেশের পুঁজিপতি লুটেরাগোষ্ঠি নিজ দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাচার করে। যে টাকা ও সম্পদ প্রবাসী শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদকসহ শ্রমিকশ্রেণি সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধানত ১০টি দেশ এই অর্থ পাচারের বড় গন্তব্য স্থল। দেশগুলো হলো সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অস্ট্রেলিয়া, হংকং ও থাইল্যান্ড। আর পাচার চলছে মূলত বাণিজ্য কারসাজি ও হুন্ডির মাধ্যমে। ব্যাংক, শেয়ার বাজার লুট করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরকে সর্বস্বান্ত করে দেয়া হচ্ছে। ধনীদের আয় বহির্ভূত কালো টাকার পরিমাণ বাড়ছে। এক বছরের ৬ লক্ষ কোটি টাকার ঘোষিত বাজেটের চেয়েও বেশি পরিমাণ কালো টাকার অর্থনীতি সমান্তরালভাবে বিরাজ করে। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আবুল বারাকাত তাঁর লেখা এবং অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক

প্রকাশিত বই 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র'তে উল্লেখ করেছেন ২০১৯ সালে ১ বছরে সৃষ্ট কালো টাকার পরিমাণ ছিল ৮,৪০,৬৫৩ কোটি টাকা। তিনি আরও তথ্য দিয়েছেন যে ১৯৭২/৭৩ সাল থেকে ২০১৮/১৯ এই ৪৬ বছরে সৃষ্ট মোট পুঞ্জীভূত কালো টাকার পরিমাণ হবে আনুমানিক ৮৮,৬১,৪৩৭ কোটি টাকা যা দিয়ে ১১ বছরের বড় বাজেট করা যায়'।

ঢাকা-সিলেট ৪ লেন প্রকল্পে যে টাকা খরচ ধরেছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে খোদ পরিকল্পনা কমিশন। ২০৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ সড়ক নির্মাণে খরচ হবে ১৭,১৬১ কোটি টাকা। সেই হিসেবে প্রতি কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে খরচ হবে ৮৩ কোটি টাকা। এক কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে ইউরোপে ব্যয় হয় ৩০ কোটি টাকা, চীন-ভারতে ১৫-২০ কোটি টাকা আর বাংলাদেশে ব্যয় হয় ৫০-৮০ কোটি টাকা! অন্যদিকে কেবল ঢাকা-মাওয়া সড়কের নির্মাণ পরিকল্পনা হয়েছিলো ৯৫ কোটি টাকা প্রতি কিলোমিটার হিসেবে। যা বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল মহাসড়ক হিসেবে এরই মধ্যে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্প সংশোধন হয়েছে ৩২টি, ব্যয় বেড়েছে ৫৯,৪১০ কোটি টাকা। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে আরও দুই প্রকল্প সংশোধন হচ্ছে। মোট ব্যয় বাড়বে ৬৩৪৯৯ কোটি টাকা (কালের কণ্ঠ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

বহুল আলোচিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়েও একটি খবর সম্প্রতি পত্রিকায় এসেছে। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের তিরুনেলভেলি জেলায় নির্মাণ করা হচ্ছে দেশটির বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কুদানকুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট। নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগের ভিত্তিতে এটি নির্মাণ করছে রুশ প্রতিষ্ঠান রোসাটমের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট। এ রোসাটমই পাবনার রূপপুরে নির্মাণ করছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। সবকিছু ঠিক থাকলে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের আগামী বছরেই উৎপাদনে যাওয়ার কথা। দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রেরই নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এক। যদিও বাংলাদেশে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় উৎপাদন ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯ দশমিক ৩৬ সেন্ট করে, যেখানে কুদানকুলামের ক্ষেত্রে তা

প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ দশমিক ৩৬ সেন্ট করে। সে হিসেবে রূপপুরে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় হচ্ছে কুদানকুলামের চেয়ে প্রায় ৭৫ শতাংশ বেশি। (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, কালের কণ্ঠ) এভাবে গোষ্ঠি স্বার্থে দেশের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে এদেশের শাসকশ্রেণি।

করোনাকালে ৭০ ভাগ মানুষের আয় কমেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে মানুষের ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমেছে। গত ১২ বছরে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৯০%, গ্যাসের দাম বেড়েছে ১৪৪%, ডিজেলের দাম বেড়েছে ৮২%, পানির দাম বেড়েছে ২৬৪%। (১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, সমকাল) গত নভেম্বরে বাস ভাড়া বেড়েছে ২৭%, লঞ্চভাড়া বেড়েছে ৩৫-৪৬%, এলপিজি গ্যাসের দাম এক বছরে প্রতি সিলিণ্ডার ৮৫০ টাকা থেকে বেড়ে ১২৪০ টাকা হয়েছে। বেড়েছে শিক্ষা উপকরণের দামও। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে আবারও গ্যাসের দাম ১১৫%, বিদ্যুতের দাম ৬৬-৭৯%, পানির দাম ২০% বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। (১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, সমকাল) এভাবে জনগণের পকেট কেটে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে উন্নয়নের নামে মহা লুটপাটের উৎসব পরিচালিত হচ্ছে। জৌলুস-চাকচিক্যের এই চোখ ধাঁধানো উন্নয়নের আলোকচ্ছটার নিচে কোটি মানুষ অন্ধকার দেখছে।

দেশের কৃষি-শিল্প, ব্যবসাসহ সার্বিক অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে। একটা অংশের মানুষ এই বর্ধিত আয়তনের অর্থনীতির সুবিধা ভোগের জন্য রাজনৈতিক দলের পদ-পদবি, অর্থ, জনপ্রতিনিধির ক্ষমতা ব্যবহার করছে। এর বাইরেও সুবিধা নিচ্ছে সরকারি আমলা, পুলিশ-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ। এদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, তার সাথে নানা কৌশলে উপরি আয় করে এরা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীতে সামিল হয়েছে। দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেছে। আবার গত নির্বাচনে সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন ও আমলাদের এমন বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ বাহিনী আজকে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন ধারণাও জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

প্রবাসী আয় ও তাদের অবস্থা:

দেশের প্রায় ১ কোটি ৩৬ লাখ মানুষ পৃথিবীর ১৬৯টি দেশে প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। প্রবাসী শ্রমিকদের ৪ বা ৫ শতাংশ সরকারি উদ্যোগে

এবং বাকি সবাই বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদেশে কাজের সন্ধানে যায়। বাংলাদেশ থেকে বিদেশ গমন খরচ পার্শ্ববর্তী সমস্ত দেশের তুলনায় বেশি এবং তাদের মজুরিও কম। ফলে তাঁরা দেশে শোষিত এবং বিদেশে প্রতারিত। প্রতি বছর গড়ে ৭ লাখ মানুষ জীবিকার সন্ধানে বিদেশে যায় এবং গড়ে ১৮ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠায়। রেমিটেন্স অর্জনে বাংলাদেশ পৃথিবীতে নবম। করোনাকালে প্রবাসী শ্রমিকরা বছরে ২৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পাঠিয়েছিল। দেশের আমদানি রপ্তানি ঘাটতি পূরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্ফীত হয় প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো টাকায়। ১০ লাখের বেশি নারী শ্রমিক প্রবাসে কাজ করে যাদের প্রায় ৯০ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করে। তাদের বঞ্চনা, প্রতারণা এবং নিপীড়নের কথা জেনেও পাঠানো হচ্ছে আর অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের কারণে ও প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে তাঁরাও যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই করোনাকালে ২০২১ সালেও ৮০ হাজারের বেশি নারী কাজের উদ্দেশ্যে প্রবাসে পাড়ি দিয়েছেন। বিমানের ফ্লাইট বিভ্রাট, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়সহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগলেও সরকার তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। অথচ বৈদেশিক রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার নিয়ে গর্ব করার বিষয়ে সরকারের বিরাম নেই। প্রতিদিন গড়ে ১১ জন প্রবাসী শ্রমিকের লাশ আসে বিমান বন্দরে। ১০ বছরে ২৬৭৫২ জন প্রবাসীর লাশ এসেছে। গত ৯ মাসে এসেছে ৩০০০ লাশ। (প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯) দেশে কাজের সংস্থান করতে পারছে না বলেই এই শ্রমিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। কিছুদিন পরপরই পত্র পত্রিকায় সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যুর খবর বের হচ্ছে। যারা কোনমতে নিজেদের সর্বস্ব বিক্রি করে প্রবাসে যাচ্ছে সেখানেও এই অদক্ষ শ্রমিকেরা যাপন করছে অমানবিক দুঃসহ জীবন। এই প্রবাসী শ্রমিকদের সিংহভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। এরা সাগরে ডুবে, গণকবরে শুয়ে, নিদারুন কষ্টে গতর খেটে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনে আর শাসকশ্রেণিভুক্ত লুটেরা গোষ্ঠি সে মুদ্রা বিদেশে পাচার করে।

শিক্ষাব্যবস্থা:

সংবিধানে ১৭(ক) অনুচ্ছেদে আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকলের জন্য একই পদ্ধতির শিক্ষার কথা বলা থাকলেও পুঁজিবাদী মুনাফাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতি শিক্ষার সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী রূপ নিয়েছে। শিক্ষার প্রধান ধারা এখন বেসরকারি এবং

বাণিজ্যিক ধারা। প্লে গ্রুপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষা কাঠামো পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং অদৃষ্টবাদী ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৭-৮% উচ্চশিক্ষা স্তরে পড়াশুনা করতে পারে তারপরও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। শিশুশ্রমিকের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের হার।

শিক্ষার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে ক্রমাগত অস্বীকার করে শিক্ষাকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫,৫৯৩টি (নতুন সরকারিকরণকৃত রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুলসহ) অপর দিকে বিভিন্ন ধারার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬৮,৫৫৪টি। ১৯ হাজার মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩২৩টি সরকারি, ২৮৯টি মাত্র সরকারি কলেজ যেখানে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৩৬৩টি আর ১৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান আরও বলছে, দেশে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয় এমন কলেজের সংখ্যা দেড় হাজারের কাছাকাছি। বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে ৫৫৩টি, যেখানে সরকারি পলিটেকনিকের সংখ্যা মাত্র ৪৯টি। দেশে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সংখ্যা ৯ হাজার। এ ছাড়া সারাদেশে 'ব্যাঙের ছাতার' মতো, অনুমোদিত অথবা অনুমোদনহীনভাবে গড়ে উঠেছে প্রায় ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল। করোনা মহামারিতে দেশে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে তিনহাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের। এসময়ে ঢাকা শহরে বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয়ার ঘটনা চোখে পড়ছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ৯৫ শতাংশই পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারিভাবে, মুনাফার উদ্দেশ্যে। এক ধারার শিক্ষার সাংবিধানিক অঙ্গীকার আজ বিস্মৃত। প্রাথমিকেই আছে ১১ ধারার শিক্ষা। গোটা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে মূলত তিন ধারায় — সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে কারিগরি ধারাও। সাধারণ শিক্ষার দূরবস্থার কথা সর্বমহলবিদিত, গ্রামের প্রায় ৭০ ভাগ স্কুলে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই, স্কুলগুলোর অবকাঠামো ভঙ্গুর, ক্লাসরুম-শিক্ষকের অভাবে পর্যাপ্ত ক্লাস হয় না। স্কুলের বদলে কোচিং সেন্টারই এখন শিক্ষার মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর

লাখো শিক্ষার্থী গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে পাস করছে কিন্তু ন্যূনতম শিক্ষার মান অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে বহুদূরে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোই ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল অথচ তার বদলে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-জীবনবোধ বর্জিত একদল ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার মাধ্যমে। ধর্মশিক্ষার কথা বলে মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে যুক্তি করা হয় অথচ ধর্মশিক্ষা আর প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা কোনভাবেই এক বিষয় নয়। ধর্ম শিক্ষা মূলত: ধর্মের উৎপত্তি, দর্শন ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা, সমাজ বিকাশের কোন ঐতিহাসিক পর্বে কোন ধর্ম আবির্ভূত হয়েছিল, অপরাপর ধর্মের সাথে তার সাযুজ্য ও পার্থক্য কী, তৎকালীন সমাজে কী প্রয়োজনে এর আবির্ভাব ঘটেছিল, কী ছিল তার কার্যকারিতা এবং আজকের সময়ে তার কার্যকারিতা কী এসকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। প্রচলিত এই মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এরা না পাচ্ছে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা, না পাচ্ছে আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের দেখা। ফলে এই মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে কূপমণ্ডুক, সাম্প্রদায়িক ও আধুনিক জীবনবোধবর্জিত একদল জনগোষ্ঠী তৈরি করা হচ্ছে। আবার কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো হচ্ছে, এর মাধ্যমে প্রায়োগিক দক্ষতাসম্পন্ন একদল মানুষ তৈরি হচ্ছে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ তৈরি হচ্ছে না। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ অবশিষ্ট নেই। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার চিত্র খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ৪৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টিতে স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। সেটাও শাসক দল বারে বারে লঙ্ঘন করে চলেছে। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের আয়তন বড় হচ্ছে কিন্তু শিক্ষার বরাদ্দ আনুপাতিকভাবে বাড়ছে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালে মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের হিস্যা ছিল ২২ শতাংশ (১৭৩ কোটি টাকা)। আর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই বছর ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেটে শিক্ষা খাতে মাত্র ৭১ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১১ দশমিক ৯১ শতাংশ এবং জিডিপির ২ দশমিক ০৮ ভাগ। যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে

সবর্নিম্ন বরাদ্দ। শাসকদের এই বাণিজ্যিক পরিকল্পনার শিকার হয়ে শিক্ষা আজ বিলাসী পণ্যে পরিণত হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা:

আমাদের দেশে বাজার ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসেবাকেও বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। কর্পোরেট পুঁজির প্রবেশের ফলে বড় বড় বেসরকারি হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি, লুটপাট ও শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। এবছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ৫.৪ শতাংশ যা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সকল দেশের চাইতে কম। মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ৭০ শতাংশের বেশি জনসাধারণকে নিজেদের পকেট থেকে খরচ করতে হয়। সরকারি হাসপাতালগুলোতে যে বাজেট বরাদ্দ হয় তার বেশিরভাগ অংশ দুর্নীতিতে লোপাট হয় আর বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যয়বহুল চিকিৎসা জনগণকে চিকিৎসা দরিদ্রে রূপান্তরিত করছে। অপর দিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষায় দ্রুতগতিতে ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ছে বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ। তাই পণ্যে পরিণত হচ্ছে চিকিৎসাসেবা। ব্যক্তির স্বাস্থ্য ব্যয় কমার বদলে বেড়ে ২০১৭ সালে ৬৭ শতাংশে আর ২০১৯ সালে ৭২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ২০১৯ সালের চিকিৎসা সেবায় ব্যক্তির খরচ মালদ্বীপে ১৬, ভুটানে ১৮, শ্রীলঙ্কায় ৪৬, নেপালে ৫৮, পাকিস্তানে ৫৪ আর ভারতে ৫৫ শতাংশ অর্থাৎ বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। (World Health Organization, Global Health Expenditure Database. Updated on January 30, 2022.) এর ফলে স্বাস্থ্যের ব্যয় মেটাতে গিয়ে আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে (প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ও ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)। চিকিৎসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ এখন লাভজনক বিনিয়োগ। সে কারণেই বিলাসবহুল হাসপাতাল আর দেশের আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছে নানা নামের ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার। হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার আছে মোট ১১৯৪০টি। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে এর মধ্যে ২৯১৬টি বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স নাই (১১ নভেম্বর ২০২০, প্রথম আলো)। ওষুধ সিন্ডিকেট

শুধু দেশের বাজার নয় বিদেশের বাজারেও ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছে ব্যাপকভাবে। করোনাকালে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা, স্বল্প বাজেট, চিকিৎসা সামগ্রী কেনাকাটায় বরাদ্দকৃত অর্থের সীমাহীন লুটপাট, দুর্নীতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে সরকারি হাসপাতালকে পঙ্গু করে বেসরকারি চিকিৎসা বাণিজ্যকে কীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এবং প্রাইভেট ক্লিনিক এখন চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রধান ধারা। ফলে স্বাস্থ্যসেবা এখন চিকিৎসা বাণিজ্যে রূপ নিয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবার প্রায় ৬৩% চিকিৎসা বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত প্রদান করছে। সরকারি হাসপাতালে শয্যা সংকট, জনবলের অপ্রতুলতার কারণ দেখিয়ে মানুষকে বেসরকারি হাসপাতালের প্রতি উৎসাহ তৈরি করা হচ্ছে। একদিকে যেমন পাঁচ তারকাবিশিষ্ট বিলাসবহুল হাসপাতাল রয়েছে, তেমনই রয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ নিম্নমানের ক্লিনিক। বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতাল রয়েছে ৬৫৪টি এবং এসব হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যা ৫১,৩১৬টি। আর বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে ৫,০৫৫টি, যেখানে মোট শয্যা সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার ১৮৩টি। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট আইসিইউ শয্যা রয়েছে মাত্র ১,১৬৯টি। এর মধ্যে সরকারি হাসপাতালে রয়েছে ৪৩২টি (ঢাকায় ৩২২, ঢাকার বাইরে ১১০) আর বেসরকারি হাসপাতালে রয়েছে ৭৩৭টি (ঢাকা মহানগরে ৪৯৪, ঢাকা জেলায় ২৬৭, অন্যান্য জেলায় ২৪৩)। এ থেকে বোঝা যায় সারা দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কী ভঙ্গুর দশা! স্বাস্থ্যসেবা জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও তার দায়িত্ব সরকার না নিয়ে এখন আবার চিকিৎসা বিমা প্রবর্তনের কথা বলা হচ্ছে যার মাধ্যমে চিকিৎসা নিয়ে ব্যবসার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা হবে।

কৃষি ও কৃষক:

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। এদেশের অর্থনীতির অন্যতম পরিচালক শক্তি হচ্ছে কৃষি। সাম্প্রতিক সময়ে করোনা কবলিত হয়ে গোটা দেশের অর্থনীতি যখন স্থবির হয়ে পড়েছিল এদেশের কৃষকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষি ফসল ফলিয়েছে। মানুষের আহারের সংস্থান করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত গত ৫০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ কিন্তু কৃষি উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। শাসকেরা খাদ্য উৎপাদনে

স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা গলা ফুলিয়ে বলছে অথচ এই যে কৃষক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এই ফসল উৎপাদন করে তার জীবনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন। কৃষি এখন আর সাধারণ কৃষকদের জন্য কোন লাভজনক পেশা নয়।

কৃষিতে পুঁজিবাদী শোষণ তীব্র রূপ নিয়েছে। বাজার সিন্ডিকেট একদিকে সার, বীজ, কীটনাশক, জ্বালানি তেল এর মূল্যবৃদ্ধি কৃষি উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষক হচ্ছে বঞ্চিত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধান, আলু, মূলা, টমেটো ইত্যাদি নানা কৃষি পণ্য রাস্তায় ফেলে সর্বস্বান্ত কৃষকের আহাজারির দৃশ্য প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমে উঠে আসছে। সরকারিভাবে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কৃষি পণ্য কেনার দাবি কৃষকদের পক্ষ থেকে বারবার করা হলেও সরকারের বাজার অর্থনীতির কবলে পড়ে গোটা কৃষি ব্যবস্থা ধ্বসে পড়েছে। আবার বন্যা, খরা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই, যতটুকু ত্রাণ তৎপরতা চালানো হয় সেটা সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের ভোগেই যায়। সাধারণ কৃষক তার দেখা পায় না। এর আগে সিডর, আইলা ইত্যাদি ঘুর্ণিঝড়ের সময় এই দৃশ্য সারাদেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। আবার এ ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কৃষি সতর্কতার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় না ফলে প্রকৃতির কাছে অসহায় হয়ে থাকে আমাদের কৃষক। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, নানা ধরণের সবজি ও ফল চাষ তো আছেই ফুল চাষের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হচ্ছে। কৃষিকাজ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে অথচ ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার ফলে কৃষি দারিদ্র্য চরম রূপ নিচ্ছে। বাজেটে কৃষিতে বরাদ্দ দিনকে দিন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং ভর্তুকির পরিমাণও কমছে। ফলে গোটা কৃষি ব্যবস্থা কর্পোরেট পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে।

কৃষি শ্রমিকদের সারা বছর কাজ না থাকায় শহরে কাজ করে কিংবা বিদেশে চাকরি করে উৎপাদন খরচ মেটানোর চেষ্টা করছে কৃষি পরিবারগুলো। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের পাশাপাশি নানা ধরণের এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে কৃষক। মহাজন বা দাদন ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন সমিতির কাছ থেকেও উচ্চহারে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে কৃষক। একদিকে খাদ্য উৎপাদন, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, সব্জি, ফল উৎপাদন বাড়ছে অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অপুষ্টির পরিমাণও বাড়ছে। ক্ষুধা বা হাঙ্গার ইনডেক্স এ বাংলাদেশ

১০৩ তম। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ক্রমাগত বাড়ছে ফলে কৃষি শ্রমিকের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সংকট পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কৃষি শ্রমিকের অবস্থান ও পেশার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। গ্রামীণ খেতমজুর শহুরে ভাসমান শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। কৃষি উপকরণ ও কৃষি পণ্য উভয়ক্ষেত্রেই বাজার সিন্ডিকেট কৃষকদেরকে সংকটে ফেলছে। দেশের মৎস্য সম্পদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা জেলেদের সংকট তীব্র রূপ নিয়েছে। ধনীদের কাছে হাওরসহ জলমহাল লিজ দেয়া, দাদন ব্যবসায়ীর কাছে জিম্মি হয়ে থাকা আর সরকারি বাহিনীর হয়রানির শিকারে পরিণত হচ্ছে জেলে সম্প্রদায়। ক্ষুদ্র চাষি, খামারি এবং কৃষি পণ্যের উৎপাদকরা প্রতিনিয়ত নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন থাকার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের বেশ কিছু কৃষি ও কৃষক স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। মোদী সরকার তার নীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের অভাবে সরকার একের পর এক কৃষিবিরোধী নীতি প্রণয়ন করে চলেছে এবং গোটা কৃষিব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

শ্রমিকশ্রেণি ও শিল্প:

১৬ কোটি ৯১ লাখ জনসংখ্যার দেশে ৬ কোটি ৮২ লাখ শ্রমশক্তি নিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৭ম বৃহত্তম শ্রমশক্তির দেশ। শিল্প, কৃষি, সেবা তিন খাতেই উৎপাদন বাড়ছে ক্রমাগত। দেশের জিডিপি ৪১৭ বিলিয়ন ডলার বা ৪৬ লক্ষ কোটি টাকা, সরকারি হিসেবে মাথাপিছু আয় ২৫৯১ ডলার বা ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালনকারী শ্রমজীবীদের মজুরি বিশ্বের যে কোন দেশের চেয়ে কম। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ আসে গার্মেন্টস খাত থেকে, গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় (চীনের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান) কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বিশ্বের সবচেয়ে কম। ২০১৮ সালে নির্ধারিত মজুরি ৮০০০ টাকা যা বর্তমানে ১০০ ডলারের কম। এ হিসেবে দেশের প্রধান খাতের শ্রমিকদের বার্ষিক আয় ১২০০ ডলার অর্থাৎ মাথাপিছু আয়ের অর্ধেকেরও কম। আর পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব নেয়ার কথা বিবেচনা করলে তা ৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র। অক্সফামের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে পোশাক শ্রমিকসহ শ্রমিকদের শতকরা ১০ জনই পর্যাপ্ত খেতে পায় না। মাস চালাতে হয় ঋণে। ৩ জনের ১ জন সন্তান থেকে দূরে থাকেন। দেশের অন্যতম

শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে শ্রমিকদের জীবন যাপনের চিত্র ফুটে উঠেছে একটি তথ্যে। টিনের ঘরে দশ ফুট বাই বারো ফুটের একটি কক্ষে গাদাগাদি করে থাকেন বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। কক্ষ ভাড়া ৩০০০ টাকা। এক কক্ষে একটি পরিবারের ৪ থেকে ৫ সদস্যের বাস। (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২, প্রথম আলো)

শ্রমজীবী দরিদ্র পরিবারের জীবনচিত্র আরেকটি তথ্যে প্রকাশিত হয়েছে, ঝালমুড়ি বিক্রেতা হামিদ মিয়া ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধ্বসে তার মেয়েকে হারান। এবার ২০২২ এর ২৩ ফেব্রুয়ারি আশুলিয়ায় জুতা কারখানার আগুনে স্ত্রী শাহানারা বেগমকে হারান। (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, কালের কণ্ঠ) ২০১৯ সালে কর্মস্থলে ১১৭৫ জন শ্রমিক নিহত, ৬৫৯ জন আহত। কর্মস্থলের বাইরে ৩২৯ শ্রমিক নিহতসহ ১২৮৫ জন খুন, নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার। (৩১ ডিসেম্বর ২০১৯, ডেইলি স্টার) এ থেকেই শ্রমিক শোষণ, বৈষম্য ও শ্রমিকদের জীবনের দুর্দশার একটা চিত্র পাওয়া যায়। শ্রমিকদের ৮৮ শতাংশ কাজ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যাদের মাসিক বেতন ও চাকুরির স্থায়িত্ব বলতে কিছুই নেই। ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম পরিবেশের দিক থেকেও বাংলাদেশ শীর্ষে। মোট শ্রমশক্তির ৫৫ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।

নিম্ন মজুরি, দীর্ঘসময় কাজ, কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু-আহত-পঙ্গুত্ববরণ, নিহত-আহতদের সামান্য ক্ষতিপূরণ (মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ ২ লাখ টাকা, যেখানে বার্ষিক মাথাপিছু আয় বলা হচ্ছে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা) বাংলাদেশকে স্বল্প মজুরি, বেশি মুনাফা আর সহজ ব্যবসার দেশে পরিণত করেছে। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ, ছাঁটাই ও শ্রম আইনের মারপ্যাঁচে শ্রমিকদেরকে আঁটকে রাখার কারণে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আকর্ষণীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। চালু ৮টি ইপিজেড এবং নির্মীয়মাণ ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘিরে শ্রম শোষণের তীব্রতা বাড়ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আই.এল.ও প্রকাশিত গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট ২০২০-২১ অনুযায়ী এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ন্যূনতম মজুরিতে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নূন্যতম মজুরি আন্তর্জাতিকভাবে দারিদ্রসীমার নিচে। শ্রম আইনকে শ্রমিক শোষণের আইনে পরিণত করে দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকারগুলো সংকুচিত করা হচ্ছে। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, স্বল্প মজুরি, সহজে

ছাঁটাই করার সমস্ত আইনি সুযোগ মালিকদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারকে আইনি মারপ্যাঁচে কেড়ে নেয়া হচ্ছে। কাগজে কলমে দেশের মোট শ্রমিকের মাত্র ৫ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আর মাত্র ৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে। এসবের বেশিরভাগ ইউনিয়ন ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত আর মালিকদের দ্বারা প্রভাবিত বলে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার সচেতন করার পক্ষে কাজ করে না। শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকায়ন, যান্ত্রিকীকরণ আর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধুয়া তুলে শ্রমিকদের চাকুরিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলা হচ্ছে। আউট সোর্সিং এর নামে স্থায়ী কর্মসংস্থানকে দিন দিন সংকুচিত করা হচ্ছে এবং বিনিয়োগের নামে দেশি-বিদেশি শোষণের কাছে শ্রমজীবীদেরকে অসহায় করে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণীত হচ্ছে। পাকিস্তান আমলেও দেশে শ্রমিকদের জন্য জাতীয় নূন্যতম মজুরির একটা কাঠামো ছিল কিন্তু দেশ স্বাধীনের ৫০ বছর পার হলেও এখনো এদেশের শ্রমিকদের জন্য কোন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নেই। যে ২২ পরিবারের শোষণের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ সংগ্রাম করেছে সেই আদমজী, ইস্পাহানীরাও শ্রমিকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করেছিল, শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে শ্রমিক কলোনিগুলোতে স্কুল, খেলার মাঠ, মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছিল যদিও তা ছিল অপ্রতুল। সে সময়ে শ্রমিকেরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আজ দেশীয় মালিকেরা সেসবের কোন ধারই ধারছে না।

পরিবেশ (দখল-দূষণ):

পুঁজিবাদী উন্নয়নের বলি হচ্ছে এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, বনভূমি, পাহাড়-সমতলসহ গোটা প্রাকৃতিক পরিবেশ। এক সময় এই বঙ্গে প্রায় ১২০০ নদী ছিল বলে জানা যায়। শাসকদের অবহেলায় নদীর সংখ্যা নিয়ে আছে বিতর্ক। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ৪০৫টি, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলছে ৭৭০টি, একজন গবেষক বলছেন ১১৮২টি। (২২ নভেম্বর ২০২১, প্রথম আলো) সর্বশেষ ২৩০টি নদীর অস্তিত্ব টিকে থাকার কথা বলা হলেও প্রতিটি নদীই টিকে আছে সংকটাপন্ন অবস্থায়। দখল-দূষণমুক্ত কোন নদীর অস্তিত্ব এখন আর নেই। ২৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথের মাত্র ৬ হাজার কিলোমিটার নাব্যতা আছে। ক্ষমতাসীনদের নদী দখল এবং শিল্প বর্জ্যে নদী দূষণ শুধু নদীগুলোর মৃত্যু ঘটাচ্ছে তাই নয়

দেশের মিঠা পানির উৎসকে ধ্বংস করছে। আবার গঙ্গা-তিস্তাসহ ভারত থেকে আসা ৫৪টি নদীতে একতরফাভাবে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করার ফলে উত্তরবঙ্গ শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার পানি ছেড়ে দিলে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হচ্ছে দেশ। দেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলগুলোকে একে একে ধ্বংস করে এখন সুন্দরবনের মৃত্যু ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে। জনআপত্তি ও বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প ও আত্মবিনাশী চরম ঝুকিপূর্ণ রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অব্যাহত রাখা হয়েছে। জ্বালানি হিসেবে কয়লার আবিষ্কার উন্নয়নের জগতে এক সময় বিপ্লব এনেছিল। কয়লাকে সোনার মতোই উপকারী মনে করা হতো। অবাধে এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে কয়লা পোড়ানো হয়েছে, তার ফলে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়েছে তা উষ্ণায়নের একটি কারণ বটে। এবারের জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অনেক ক'টি কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প বাতিল করার; কিন্তু যে বড় দু'টি প্রকল্পের কাজ চলছে তার সম্বন্ধে কিছু বলেনি। একটিতে সুন্দরবনের, অপরটিতে সেন্টমার্টিন ও তার আশেপাশের এলাকার পরিবেশের ক্ষতি হবে বলে দেশের মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তথাকথিত উন্নয়ন রাষ্ট্রশাসকদের হাত-পা-গলা সবকিছু চেপে ধরে রাখে। সারা দুনিয়ার মানুষ যখন কয়লার উপর নির্ভরতা কমাচ্ছে আমাদের সরকার তখন এধরণের পরিবেশ বিধ্বংসী জ্বালানির উপর নির্ভরশীল হয়ে একের পর এক প্রকল্পের ঘোষণা দিচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (এফ এ ও) এর প্রতিবেদন মতে গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার হেক্টর বনভুমি কমেছে। বিশ্বের বনভুমি কমার দেশের তালিকায় বাংলাদেশ শীর্ষে। পরিবেশ দূষণে ১৮০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯। পুঁজিপতিদের দ্রুত মুনাফা অর্জনের জন্য দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে যার বিষময় ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ আর স্থায়ী কুফল ভোগ করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। নদী, জলাভূমি, বন, পাহাড়, খাসজমি, খোলা প্রান্তর আর রাখঢাক করে দখল করছে না ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা। ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সংসদকে জানান, দেশের ৬৪ জেলায় চিহ্নিত অবৈধ নদ-নদী দখলদারের সংখ্যা ৪৯ হাজার ১৬২। অন্যদিকে ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বন বিভাগের দেওয়া তথ্য বলছে, সারা দেশে ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৫৮ একর

বনের জমি জবরদখল করে রেখেছেন ১ লাখ ৬০ হাজার ৫৬৬ ব্যক্তি। দখলকৃত জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা, কটেজ, ফার্ম, রিসোর্ট ও বাগান। নির্বিঘ্নে চলছে কৃষিকাজ, পশুপালন। দখলের থাবা থেকে রক্ষা পায়নি সংরক্ষিত বনভূমিও। ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬১৩ দশমিক শূন্য ৬ একর সংরক্ষিত বনভূমিতে দিব্যি 'মালিকানা' স্থাপন করে বসে আছেন ৮৮ হাজার ২১৫ জন। সংসদে এই সব তালিকা উত্থাপন হওয়ায় এটা পরিষ্কার যে জনগণের সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগ করে লুট করার ব্যবস্থা কত শক্তিশালী। কিন্তু দখলদারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা উৎসাহিত হচ্ছে। বায়ুদূষণে এবং সামগ্রিক বসবাস অযোগ্যতায় ঢাকা শহর সারা বিশ্বে শীর্ষ স্থানেই উঠে বসে আছে। দূষণের কারণে ঢাকায় প্রতি মিনিটে ৪ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করে বলেও গণমাধ্যমে খবর এসেছে।

গ্যাস, বিদ্যুৎসহ জ্বালানি খাত :

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে ক্রমাগত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে জ্বালানি খাত। গ্যাসক্ষেত্রগুলো বিদেশি কোম্পানিকে তুলে দেয়া, এলএনজি ও এলপিজি আমদানি এবং বিপণনের ব্যবস্থা করে ব্যবসায়ীদের নিরাপদ ও নিয়মিত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিণত করা, বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, আমদানি, বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে জনগণকে জ্বালানি খাতের অসহায় শিকারে পরিণত করা হচ্ছে। লুটপাট ও দুর্নীতির দায় জনগণের উপর চাপিয়ে একদিকে ভর্তুকি বাড়ানোর নামে জনগণের ট্যাক্সের টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। অন্যদিকে ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হয়েছে। জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণন সরকারের হাতে থাকলেও দুর্নীতি ও শুল্ক আরোপের ফলে দফায় দফায় দাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরকার ট্যাক্স আদায়কারী সংস্থায় পরিণত হয়ে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পথ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) তথ্যমতে, ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে গত অর্থবছর পর্যন্ত বেসরকারি বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) ও রেন্টাল কেন্দ্রগুলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া ৬১ হাজার ৪৬২ কোটি টাকা কেন্দ্র ভাড়া বা ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে পেমেন্ট দিয়েছে। এই একই সময় ২ লাখ ৯৩ হাজার ২৯৪ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনেছে বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর কাছ থেকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। জাতীয় সংসদে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত ১০ বছরে

সরকার বিদ্যুৎ খাতে ৫২ হাজার ২৬০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। ফলে ভর্তুকির টাকা গেছে ব্যবসায়ীদের অলস বিদ্যুৎকেন্দ্রের পেছনে। আর বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সরকার বাকি অর্থের সমন্বয় করেছে। গত ১০ বছরে সরকার সাতবার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। সর্বশেষ গত মার্চে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। (২৬ জুন ২০২০, প্রথম আলো) জনগণের পকেট কেটে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে পরিচালিত এসকল রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানোর বিশেষ আইনের (দায়মুক্তি আইন) মেয়াদ আরও পাঁচ বছরের জন্য আবার বাড়ানো হয়েছে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, 'দেশে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যাদের হাতে দেশের জ্বালানি খাত ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে। তারা অতি মুনাফার জন্য দেশের পরিবেশ ও জলবায়ুর ক্ষতি করে হলেও অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ... দেশকে আর্থিকভাবে বিপদে ফেলছে। (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, প্রথম আলো) সচেতন সকল মহলের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হলেও সরকার সেদিকে কোন কর্ণপাত করেনি। বরং কোন রকমের দরপত্র ছাড়া সরকারি দলের আশীর্বাদপুষ্ট এসকল ব্যবসায়ীদের স্বার্থই তাদের কাছে সর্বাধিক বিবেচনাযোগ্য ছিল। ২০২০-২১ সালে এক বছরে অবৈধ সংযোগ দেয়ার ফলে তিতাস গ্যাসের বার্ষিক ক্ষতি হয়েছে ৩২০ কোটি টাকা। (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২, কালের কণ্ঠ) এভাবে গ্যাস-বিদ্যুৎসহ জ্বালানি খাতে সরকারের মদদে একটা হরিলুটের ব্যবস্থা চলছে। আর এই লুটের দায় জনগণের কাঁধে চাপানো হচ্ছে অহর্নিশ। সরকারের ভুলনীতি ও দুর্নীতির কারণেই ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে হচ্ছে জ্বালানির। এর প্রভাব পড়ছে সর্বত্র, দুর্ভোগ বাড়ছে জনগণের।

নারী অধিকার:

সভ্যতা বলতে নারী সভ্যতা বা পুরুষ সভ্যতা বোঝায় না। নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই গড়ে উঠে মানব সভ্যতা। আমাদের সংবিধানের ২৮(২) ধারায় আছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। একটা সমাজ কতটা গণতান্ত্রিক তা বুঝা যায় ঐ সমাজের নারীর অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান কতটুকু তা দিয়ে। সংবিধানে সমতার কথা বলা থাকলে আমাদের দেশে নারী-পুরুষের এক চরম বৈষম্যমূলক অবস্থা বিরাজ করছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র এবং পরিবার সকল

ক্ষেত্রেই নারীর উপর সহিংসতা বেড়েই চলেছে। এক বছরে পুলিশের কাছে পাওয়া অভিযোগ থেকে এর সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ নারী নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে আসা কলগুলোকে নয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। ২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নারী নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়ে মোট কল এসেছে ৭ হাজার ১৫১টি। এর মধ্যে স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে কল এসেছে সবচেয়ে বেশি ৪৭ শতাংশ। এ ছাড়া ধর্ষণের অভিযোগ ৮২৪টি, ধর্ষণচেষ্টা ৩৯০টি, ধর্ষণের হুমকি ৩৬টি, পাচার ১৯টি, যৌন সহিংসতা ৩৯৭টি, বাড়িতে সহিংসতা ১২৯ এবং বাড়ির বাইরে ৭১টি সহিংসতার অভিযোগে কল আসে। শুধু দেশের তথ্য নয় আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশের নারীর বিপন্নতার চিত্র উঠে এসেছে। বিশ্বের ১৬১ টি দেশ অঞ্চলে ২০০০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, স্ত্রী নির্যাতনের হারে বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ। ইভ টিজিং এর শিকার ২৮ শতাংশ, যৌন সহিংসতায় ঢাকা বিশ্বে চতুর্থ। পুঁজিবাদ উৎপাদনের প্রয়োজনে নারীর শ্রমকে কাজে লাগায় কিন্তু শ্রম শোষণ ও মজুরি বৈষম্য নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। নারী শ্রমকে এখনো সস্তা হিসেবে দেখা হয়। একই কাজ করে একজন নারী শ্রমিক কোন কোন ক্ষেত্রে পান পুরুষের অর্ধেক মজুরি। রাষ্ট্রীয় এবং বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে নারীরা অধিষ্ঠিত হলেও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমকাজে সমমজুরির দাবি এখনও উপেক্ষিত। দেশের শ্রম শক্তির ৩৬ শতাংশ নারী, যদিও নারীর গৃহস্থালি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বা জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কৃষিসহ নানা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে কিন্তু মর্যাদা ও নিরাপত্তার অভাবে ট্রেড ইউনিয়নসহ সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এখনও কম। গৃহ কর্মী কনভেনশন ১৮৯ এবং কর্ম ক্ষেত্রে সহিংসতা প্রতিরোধে কনভেনশন ১৯০ সরকার এখনও অনুস্বাক্ষর করেনি এবং সে অনুযায়ী আইন প্রবর্তন করা হয় নি। পারিবারিক আইন এখনো ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে নারী সমাজ এখনো সম্পত্তিতে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত। সন্তানের অভিবাবকত্ব, বিবাহ, তালাক ইত্যাদির ক্ষেত্রেও নানা পুরুষতান্ত্রিক নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে নারীকে। ইউনিফর্ম সিভিল কোডের দাবি বারবার নারী সমাজসহ সচেতন মহলের পক্ষ থেকে করা হলেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত একটা ভীতিকর পরিবেশে জীবন যাপন করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার কবলিত বাংলাদেশে যে ভয়ানক অবস্থা তৈরি হয়েছিল আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও নারীদের জন্য প্রায় একই ভীতিকর পরিবেশ সমাজে তৈরি আছে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, 'টিকটক তারকা' বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে গত এক বছরে দেড় হাজার নারী পাচার হয়েছে। পাচারের শিকার ভারত ফেরত তরুণী জানিয়েছেন, তিনি একা নন, আরও অনেক বাংলাদেশি মেয়ে পাচার হয়ে ভারতের বিভিন্ন শহরে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। চাকরি দেওয়ার নাম করে তাদের যৌনকর্মী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে দুই লাখ নারী-পুরুষ ও শিশু পাচার হয়েছে। প্রতিবছর ২০ হাজার নারী ও শিশু ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়ে যায়। অপর এক হিসেবে দেখা যায়, ভারতে অথবা ভারত হয়ে অন্য দেশে ৫০ হাজার নারী পাচার হয়ে গেছেন। ২০২০ সালে মানব পাচারের যে ৩১২টি মামলার বিচার হয়, সেগুলোর ২৫৬টি ছিল নারী পাচার ও যৌন সহিংসতা সংক্রান্ত। করোনাকালে যেখানে সীমান্তে স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ, সেখানে পাচারকারী চক্র কীভাবে নির্বিঘ্নে এসব অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে? (৪ জুন, ২০২১, প্রথম আলো) এর বাইরে পুরুষশাসিত সমাজের নানা পিছিয়ে পড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে নারীদের জীবন হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। একদিকে পুঁজিবাদ তার পণ্যের প্রচারে নারীকে ভোগ্য পণ্যের মত ব্যবহার করছে, আবার আরেকদিকে মৌলবাদীরা ধর্মীয় কূপমণ্ডুক ব্যাখ্যা দিয়ে নারীকে অধস্তন করে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। গ্রামীণ সালিশে এখনো কথিত শরীয়াহ আইনে নারীদের উপর নানা অত্যাচার চালানো হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও নারীকে আইনগতভাবেই অধস্তন করে রাখা হয়েছে।

উন্নয়ন ও গণতন্ত্র :

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এখন বিশ্বাস করে তাদের তথাকথিত "উন্নয়ন" এবং বুর্জোয়া অর্থেও গণতন্ত্র একসাথে চলা সম্ভব না। এটা হয়তো খোলামেলা বলে না কিন্তু তাদের নীতি নির্ধারকরা এ ব্যাপারে একমত। তারা বলে চীন, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার মতো দেশে প্রচলিত গণতন্ত্র থাকলে অর্থনৈতিক উন্নতি হতো না। দেশের প্রশাসন ও শাসনকার্যের সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যেও এ ধারণা গড়ে তুলতে শাসক দল সক্ষম হয়েছে। কোন

দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিদ্যমান বাস্তবতা কী তা বিবেচনা না করে কর্তৃত্ববাদের শাসন প্রশাসন একাকার করে ফেলা হয়েছে। ফলে গণতন্ত্র দূরে থাক, ভোটতন্ত্রও রক্ষা করার ধার ধারছে না। আবার ভিন্নমত বা চিন্তার উপর চূড়ান্ত দমন পীড়ন চালাচ্ছে সরকার। নিজেদের লুটপাট-দুর্নীতিকে ঢাকতে জনগণের ন্যূনতম প্রতিবাদকেও সহ্য করতে পারছে না। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র থেকে শুরু করে শিক্ষক, সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট কেউই রেহাই পাচ্ছেনা সরকারের কোপানল থেকে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে এই দমন পীড়ন আর ভিন্ন চিন্তা হটানোর আইনি ভিত্তি তৈরি করেছে সরকার। কথায় কথায় এই আইনে গ্রেফতার করা হচ্ছে, বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটকে রাখা হচ্ছে। লেখক মোশতাককে দীর্ঘদিন আটকে রেখে নির্যাতন করার ফলে কারাভ্যন্তরেই তার মৃত্যু ঘটে, নির্যাতন করে চোখ নষ্ট করে দেয়া হয় কার্টুনিস্ট কিশোরকেও। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ সরকারের সমালোচনা করলেও রেহাই পাচ্ছে না, বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে এর মধ্যে গ্রেফতার করে নাজেহাল করা হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধানীর মাধ্যমেই শাসকশ্রেণি বিশেষ ক্ষমতা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সকল কালাকানুন প্রণয়নের রাস্তা তৈরি করেছে। বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড, ক্রসফায়ার, গুম-খুন ইত্যাদি তো যেকোন সময়ের তুলনায় রেকর্ড ছাড়িয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর রিপোর্ট বলছে ২০০৯-২০১৯ এর ভেতর বাংলাদেশের ৮৩০ জন মানুষ গুম হয়েছে। এই দশককে তারা গুমের দশক বলে আখ্যায়িত করেছে। দেশজুড়ে জনমনে এক চরম ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে স্ট্যাটাস দেয়ায় বুয়েট এর শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার বদৌলতে ক্ষমতাসীনরা মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে পুঁজি করে এক চরম উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবোন্মাদনা তৈরি করেছে। ভিন্নমত বা চিন্তা যা শাসকদের কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তাকেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী আখ্যা দিয়ে দমন করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সোল এজেন্ট হয়ে নিজেদের সুবিধা এবং প্রয়োজনমতো মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে ব্যবহার করছে। ফলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের যে সংগ্রামী চেতনা তা এরা যাতনায় পরিণত করেছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে ফিকে হয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী শৌর্য।

সংস্কৃতি:

সাংস্কৃতিকভাবে একটা জাতিকে অন্তঃসারশূন্য করার যে আয়োজন তার সমস্তটাই শাসকদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। সংস্কৃতির মান এমন জায়গায় গিয়েছে যে, রীতিমতো তা আশঙ্কার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংস্কৃতিক চর্চা বলতে টেলিভিশন কেন্দ্রিক বিনোদন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবনচিত্র নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সংস্কৃতির চর্চা হতো সেগুলো এখন আর নেই। সব চলে এসেছে শহর ও টেলিভিশনে। সকল ক্ষেত্রেই জীবনমুখী সৃষ্টিশীলতা খুঁজে পাওয়া ভার। কিছু ব্যাতিক্রম বাদে নাটক-সিনেমাসহ শিল্পের সকল মাধ্যমই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকূল সাংস্কৃতিক জমিন তৈরির লক্ষ্যে ভোগবাদী ব্যক্তিসর্বস্ব উপাদানে সয়লাব হয়ে গেছে। পালটা যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্রোতধারা আছে তার কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই। বরং সকল শিল্প মাধ্যমকেই দলীয় প্রচারযন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। আর তারুণ্যের শক্তিকে নির্জীব করে রাখতে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এলএসডি, আইস, ইয়াবাসহ মাদকের বিশাল সাম্রাজ্য। দেশের প্রায় ৮০ লক্ষ যুবক-যুবতী এখন মাদকাসক্ত। মাদক অর্থনীতির আয়তন বিশাল। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দুদকে ১৪১ জন্ মাদক ব্যবসায়ের ডনদের তালিকা দিয়েছে। সেখানে সরকারি দলের এমপি ও তার পরিবারের লোকজন, যুবলীগ নেতা, উপজেলা চেয়ারম্যান, সিআইপিসহ বিভিন্ন সরকার ঘনিষ্ঠ মহলের নাম আছে। সরকার মাঝে মাঝে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে মাদক পরিবাহীদের বিনা বিচারে হত্যা করার নাটক করে, কিন্তু এসকল শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে দহরম মহরম বজায় রেখে তাদের প্রশ্রয় দিয়ে গোটা তরুণ-যুবসমাজকে সমাজবিচ্ছিন্ন ও চিন্তাভাবনাহীন করে ফেলার দিকে এগোচ্ছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তি এক অপার সম্ভাবনা যেমন নিয়ে এসেছে আবার পৃথিবীর একমাত্র স্বঘোষিত ডিজিটাল দেশে ইন্টারনেটের ভয়ানক নেতিবাচক প্রভাব এদেশের তরুণ-যুব সমাজের উপর পড়ছে। মাদকের মতো পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে দেশের যুব সমাজের একটা বড় অংশ। আবার বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আচ্ছন্ন হয়ে সমাজবিমুখ হয়ে পড়ছে গোটা তরুণ প্রজন্ম, বাড়ছে সাইবার অপরাধ। যেকোন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নও একই সাথে যুক্ত, তা না হলে সেই প্রযুক্তি সমাজের যতটা অগ্রগতি ঘটাতে পারত তার চেয়ে জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব বেশি পড়ে। বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও আধুনিক ভাবমানস ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনবোধ তৈরির বদলে একটা ভোগসর্বস্ব, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রজন্ম তৈরি করছে।

এক কথায় সংস্কৃতি হচ্ছে আদি মানবের আধুনিক মানবিক নান্দনিক ভূষণ। সংস্কৃতি ও শিক্ষা মিলে সভ্যতার ভিত রচনা করে। সংস্কৃতি মানুষকে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা পূরণের প্রাণী বৈশিষ্ট্যের বাইরে এনে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, চেতনাকেন্দ্রিক জীবনাচরণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনালোকে উদ্ভাসিত করে। বৈষয়িক উৎপাদন বিকাশে প্রণোদনা জোগায়। ভাবকেন্দ্রিক উৎপাদন তথা জ্ঞান জগতের অন্য সকল ক্ষেত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অগ্রসরমান বৈপ্লবিক সমাজ রুপান্তরের আন্দোলন, উন্নত অগ্রসরমান সংস্কৃতিকে নানা বিস্তারে সৃষ্টির পরিবেশ রচনা করে। আবার উন্নত সংস্কৃতি অগ্রসরমান সমাজ-সভ্যতা নির্মাণের আন্দোলনে গতিশক্তি বাড়ায়। এরা একে অপরের পরিপূরক। অথচ পুঁজিবাদী স্থূল ভোগবাদী সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে গিয়ে সংস্কৃতির এই বোধ চেতনাকে অনুপস্থিত করে ফেলা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও আদিবাসীদের অবস্থা:

১৯৪৭ সালের রাষ্ট্র বিভাজনের পর অবিভক্ত ভারতের বাঙালি জাতিসত্ত্বাভুক্ত জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশ হয়ে গেল ভারতীয় আর পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী আমরা হয়ে গেলাম জাতি পরিচয়হীন। আমরা না পাকিস্তানি না ভারতীয়। জাতিসত্ত্বা হিসেবে আমরা বাঙালি কিন্তু জাতি হিসেবে পাকিস্তানি জাতির সাথে না ছিল ভূখণ্ডগত মিল, না ছিল সংস্কৃতির বন্ধন। জাতি পরিচয়ের বিকাশের স্বার্থেই এই বঙ্গের বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষের নেতৃত্বে শুরু হয় জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম। যদিও এই অঞ্চলে বাঙালিই একমাত্র জাতিসত্ত্বা নয়, পাহাড় ও সমতল মিলে প্রায় ৫০ রকমের জাতিসত্ত্বার বসবাস রয়েছে এখানে। বাঙালি জাতিসত্ত্বার সাথে সাথে এই বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষও এই মুক্তির সংগ্রামে সামিল হয়। এই সকল জাতিসত্ত্বা মিলেই গড়ে ওঠে আমাদের জাতি পরিচয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্যান্য সকল জাতিসত্ত্বার মানুষকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হল না, তাদের জাতিগত নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা হল।

দেশের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও আদিবাসীরা ক্রমশ প্রান্তিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তাদের ভুমির অধিকার, সংস্কৃতি, ভাষাসহ অর্থনৈতিক জীবনধারা যেমন

বিপন্ন দশায় তাদের অস্তিত্বও তেমনি হুমকির মুখে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও আদিবাসী বলে স্বীকার না করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। পাহাড় ও সমতলের ৫০টিরও বেশি বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভূমি, খাদ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়ছে। তাঁরা এখনও সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনেক দুর্বলতা নিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি হলেও তা বাস্তবায়ন না করে রাষ্ট্র তাদের সাথে প্রতারণামূলক আচরণ করে আসছে। যেমন, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার দীর্ঘদিনের দাবি মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি হলেও এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এবং ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা স্বীকার করা হলেও তা আজও রূপায়িত হয়নি। দখলদারদের হাত থেকে সমতলের আদিবাসীদের বন, ভুমি কিছুই নিরাপদ নয়। আদিবাসীদের ভুমি কমিশন গঠনের দাবি এখনও উপেক্ষিত।

বিদেশ নীতি:

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫(গ)-তে বলা আছে, 'বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন'। সংবিধানের এই বিধি থাকার পরও বাংলাদেশের কোন সরকারই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের হানাদারি, অন্যায় অবরোধ, পরদেশ দখল ও সম্পদ লুণ্ঠন যেমন ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়ায় আগ্রাসন, দখল, লুণ্ঠন গণহত্যাবিরোধী কোন বলিষ্ঠ অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশে নানামুখী হস্তক্ষেপ ও আধিপত্যবিস্তারমুখী কার্যকলাপের বিরোধিতা বা নিন্দা করতে দেখা যায়নি। বরং অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, সীমান্ত হত্যা বন্ধ, বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর বদলে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, আসাম রাজ্যসহ ভারত থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠী বিতাড়ণের হুমকি ও সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি, বাংলাদেশকে পাকিস্তান, আফগানিস্থানের সঙ্গে এক কাতারবন্দী করা ইত্যাদি নীরবে হজম করা হয়েছে। চীন, ভারত, জাপান বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ মিত্র দাবি করার পরও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে এদের কারো কাছ থেকেই কোন ইতিবাচক সাড়া লাভ করতে পারেনি।

মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্যিক তৎপরতা থাকলেও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সরকার ক্রমাগত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরেও কার্যকর সমর্থন লাভের উল্লেখযোগ্য তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ক্রববর্ধমানহারে ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ নানা মাদকদ্রব্য চোরাচালান বাণিজ্যে বাংলাদেশকে তাদের মাদকের বাজারে পরিণত করার বিরুদ্ধেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয়নি। সীমান্ত হত্যা তো চলছেই। সবকিছু মিলে এককথায় জাতীয়-আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি চরম দেউলিয়াত্বে ডুবে রয়েছে এবং জাতিকে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কাছে জিম্মি দশায় পতিত করে দেশকে সর্বনাশা পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এই পরিণতির দিকে আসতে হলো কেন?

এটা বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদের চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগে পুঁজিবাদের পথে হাঁটার ফল। বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পরিণতি। যে অঙ্গীকার এবং গণচেতনা-গণআকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে জনগণ জীবনবাজী রাখা যুদ্ধে জয়ী হয়ে একটা দেশকে স্বাধীন করে সে দেশকে তার বিপরীত মুখে চালিত করে কোনদিন সাম্য সমতার, সকল মানুষের সমমর্যাদার ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের ও জনগণের ক্ষমতায়নের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌ বহর পাঠিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের অমিত তেজ ও বিপ্লবী স্পর্ধায় তারা পালাতে বাধ্য হয়েছিল। আজ শাসকশ্রেণি পালানোর পথ খোঁজে। বিগত ৫০ বছরের শাসনে এ কথা প্রমাণিত যে পুঁজিবাদী পথে বুর্জোয়াশ্রেণির শাসন প্রশাসনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণআকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাদের দ্বারা মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কারণ একদিন বুর্জোয়াশ্রেণি দার্শনিকভাবে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যে যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শনের হাতিয়ারে মোকাবিলা করতো আজ তা অকার্যকর। এখন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের হাতিয়ার ছাড়া আদর্শিক-দার্শনিকভাবে মৌলবাদকে মোকাবিলা সম্ভব নয়। আর এটা মানলে সমাজ বিকাশের ধারায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের অনিবার্যতা মানতে হয় এটা বুর্জোয়ারা মানতে বা গ্রহণ করতে পারে না বিধায় এটাকে তাদের দার্শনিক সীমাবদ্ধতা বলা চলে। দ্বিতীয়ত: শ্রেণিগতভাবে এ যুগে বুর্জোয়াদের দ্বারা জনগণের মধ্যে ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ চর্চা সম্ভব নয়। কারণ

জনগণের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলে তারা শোষণ-বঞ্চনার কার্যকারণ সম্পর্ক ধরতে পেরে পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন মানবে না ফলে বুর্জোয়াশ্রেণির শাসন-শোষণ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। জনগণকে বিভক্ত রাখা ও শাসন-শোষণ বহাল রাখা কঠিন হবে। এটা তাদের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা। আর তৃতীয়ত: মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও শক্তিকে জাগিয়ে না রাখলে প্রগতিবাদী রাজনীতিকে প্রতিহত করা, জনগণকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে বিভক্ত রাখা কঠিন হয়ে যাবে। আর ইহজাগতিক চিন্তা, জীবনবোধ যুক্ত হলে শোষিত মানুষের মিলিত ঐক্যের শক্তি তৈরি হবে যা বিপ্লব ডেকে আনতে পারে। এখান থেকে আসে বুর্জোয়াশ্রেণির বিপ্লব ভীতি। আমাদের দেশের বুর্জোয়াশ্রেণি শাসনের ইতিহাস স্পষ্টতই একথাগুলো প্রমাণ করে। যে বামপন্থিরা মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ঠেকাতে শ্রেণি এবং সময়কালের বিবেচনার বাইরে গিয়ে মন্দের ভালো কিংবা ঐতিহ্যের নজির খুঁজে বুর্জোয়াদের কোন এক শক্তির সাথে শামিল হয়েছিলেন, তারাও উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্তির পথ খুঁজছেন। আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া দেশে বুর্জোয়াশ্রেণির পক্ষে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা-শৃঙ্খল মুক্ত থাকা কিংবা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তি থেকে নির্ভরতামুক্ত হয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে স্বাধীন জাতীয় বিকাশের দুরূহ রাস্তায় চলা সম্ভব নয়।

তাহলে কী করণীয়?

রাজনীতির সংকট রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হয়। এখন যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি সামনে আছে তার মধ্যে আছে (১) বুর্জোয়া কর্তৃত্ববাদী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ এবং তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও মহাজোট এবং বিএনপি ও তাদের জোট মিলে প্রধান বুর্জোয়া ধারা (২) উদারপন্থি সংস্কারপন্থি দল ও গ্রুপসমূহ (৩) ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ (৪) বাম প্রগতিশীল দল ও শক্তিসমূহ। বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ছোট খাট অদল বদল কিংবা জোড়াতালি মেরামতে হবে না। বুর্জোয়াদের গোপন কিংবা প্রকাশ্য আপস আঁতাত ফর্মুলা বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পরামর্শ-চাপেও সমাধান মিলবে না। অতীতের কয়েক দফা সামরিক হস্তক্ষেপেও সমাধান স্থায়িত্ব পায়নি। উদারপন্থি সংস্কারবাদীরা শক্তিহীন হওয়ার কারণে শক্ত কোন খুঁটির দিকে হেলে পড়ার ঝোঁক থেকে মুক্ত থেকে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছে না। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক

শক্তি পরগাছা বিস্তারে যতই ছেয়ে যাক মূল বৃক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে পারছে না তাই যাদের সহযোগে তারা আসতে চাইবে তারা দক্ষিণপন্থায় আরও বেশি ঝুঁকে দেশকে আরও পশ্চাদ দশায় নিয়ে যাবে যা পরিবর্তনকামী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই সকল বামপন্থি শক্তি সর্বোচ্চ সমঝোতা ও সর্বনিম্ন কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হলে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের সংগ্রামে জনসমর্থন লাভ করবে। এর প্রভাব সমগ্র রাজনীতির উপর পড়বে, রবফ গলবে। আমরা এই কংগ্রেসে সেই আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের পুরো অধ্যায় পাঠের পাশাপাশি ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের বিপ্লব প্রচেষ্টা, ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ জরুরি কারণ এদেশের সমাজ বদলের জন্য জনগণের উত্থান তথা গণঅভ্যুত্থানই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথ। সেই লক্ষ্যে বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করে মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। কর্তৃত্ববাদী শাসন মোকাবেলায় যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদী শক্তিগুলি জনগণের সামনে গণদাবি ও গণআকাঙ্ক্ষা পূরণের পরীক্ষা দিয়ে সংগ্রাম এগিয়ে নিতে পারে।

করোনা পরবর্তী সময়কালে সারা দুনিয়াব্যাপী রাজনীতি-অর্থনীতিতে নতুন কিছু প্রবণতা দেখা দেবে। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে যুদ্ধোন্মাদনা ও যুদ্ধ, সামরিক অভ্যুত্থান, গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি ইত্যাদি দেখা দেবে। এরই মধ্যে সারা দুনিয়ায় এর কিছু নজির দেখা দিচ্ছে। দেশে দেশে আবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনও গড়ে উঠবে। কোন কোন দেশে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানও সংঘটিত হতে পারে আবার কোথাও বিপ্লবী দলের শক্তিশালী অনুপস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রবল গণজোয়ার কাজে লাগিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। আবার এসকল আন্দোলনকে ভিন্নখাতে পরিচালিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিস্তার ঘটারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

১৯৮০ সালে আমাদের দল ঘোষণার সময়ে আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদী, বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, এদেশের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক। দল গঠনের পর থেকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির সামনে আমরা যে বক্তব্য রেখেছি তা আমাদের মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সর্বদাই বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজ আমাদের প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে যখন আমরা এই জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করছি আমাদের প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তব্য আরও বেশি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এমনকি অন্যান্য বামপন্থি রাজনৈতিক দলসমূহও তাদের পূর্বতন অবস্থান থেকে নতুনভাবে ভাবার চেষ্টা করছেন। আজকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের গোটা অর্থনীতিই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। লেনিনের ভাষায় বলা যায়—'the speediest and freest development of the productive forces on a capitalist basis'। শুধু তাই নয় এমন একদল ধনকুবের গোষ্ঠী এখানে তৈরি হয়েছে যাদের বাৎসরিক টার্ন-ওভার কয়েক হাজার কোটি টাকা। এই ধনকুবেররা শুধু দেশে বিনিয়োগ করছে তা নয় দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশেও অর্থ লগ্নী করছেন। গোটা কৃষি এখন কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কৃষিপণ্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য যা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আবার গোটা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অংশ হিসেবে বাংলাদেশকেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের গাঁটছড়া বেধে চলতে হয়। তবে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা এখন আর এককেন্দ্রিক অবস্থায় নাই তা বহুকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে ফলে বাংলাদেশের মতো ছোট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোরও দর কষাকষির সক্ষমতা আগের তুলনায় বেড়েছে যা সাম্প্রতিক বহু ঘটনা প্রবাহে দৃশ্যমান।

লেনিন বলেছিলেন, 'বুর্জোয়া বিপ্লব পুরোনো দিনের মতো সার্থকভাবে সম্পন্ন হবে আজ একথা ভাবা মানে হল মার্কসবাদের সৃজনশীল সত্তাকে হত্যা করে তাকে পুঁথিগত বিদ্যার স্তরে নামিয়ে আনা'। সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে বুর্জোয়া শ্রেণি তার বিপ্লবী চরিত্র খুইয়ে ফেলেছে বলে অর্থনীতিসহ সমাজ ও মানবজীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণ করা আর বুর্জোয়াদের পক্ষে সম্ভব নয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের এই অপূরিত কাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা মনে করি উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র হল একটি স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। এদেশের

পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাই তার উদ্দেশ্য- তা সে জাতীয়করণ করেই হোক, বিরাষ্ট্রীয়করণ করেই হোক, চুরি-দুর্নীতি-লুটপাটকে প্রশ্রয় দিয়েই হোক, নির্বাচিত সরকার বা সামরিক শাসন চালিয়েই হোক, একদলীয় ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়াতেই হোক, সাম্রাজ্যাবাদের সহায়তা বা গাঁটছড়া বেধেই হোক যেকোন প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করাটাই হল তার একমাত্র কাজ। আর এই পুঁজিবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ, যা মানবতার শেষ বিন্দুটিকেও জলাঞ্জলি দিয়েছে। এই পুঁজিবাদ সভ্যতার অগ্রগতি, মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির পথ রুদ্ধ করে বসে আছে। এই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করাই আজ সমাজ বিকাশের একমাত্র পথ। আর ঐতিহাসিক এ কাজ সর্বহারা শ্রেণি ছাড়া কেউ করতে পারে না। আর এই পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার লড়াইয়ে একই সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই পরিচালনার দায়িত্বও সর্বহারা শ্রেণিকে পালন করতে হবে। সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে গরিব কৃষক ও সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মৈত্রীর ভিত্তিতে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এ সময়ের জরুরি কাজ। আর এটাই বস্তুজগৎ ও ভাবজগত তথা মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তি মালিকানাকে নিঃশেষ করে সামাজিক মালিকানার সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছার একমাত্র পথ।

এই লক্ষ্যে আমাদের বিপ্লবী শক্তির রাজনৈতিক শ্রেণি-সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে, যা ছাড়া আন্দোলনকে অর্থনৈতিক আন্দোলনের গন্ডী অতিক্রম করে বিপ্লবী আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করা সম্ভব না। এ খুব সহজ প্রক্রিয়া নয়, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পার্টি কমরেডদের, কমরেড লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী, পৌঁছতে হবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে, শুধুমাত্র ছাত্র, মধ্যবিত্ত কিংবা শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নয়। কমরেড লেনিন বলেছিলেন–'রাজনৈতিক শ্রেণি চেতনা শ্রমিকদের মধ্যে আনা যায় কেবলমাত্র বাইরে থেকে, অর্থাৎ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লড়াই বা শ্রমিক ও মালিকদের সম্পর্কের ক্ষেত্রের বাইরে থেকে। যে ক্ষেত্র থেকে একমাত্র এই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব তা হল রাষ্ট্র এবং সরকারের সাথে সমস্ত শ্রেণি এবং সামাজিক স্তরের সম্পর্কের ক্ষেত্র, সমস্ত শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র। সেই কারণে, শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান উন্মেষের জন্য কী করতে হবে এই প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র এমন উত্তর হতে পারে না যেমনটা লড়াইতে থাকা কর্মীরা, বিশেষতঃ যাদের অর্থনীতিবাদের প্রতি ঝোঁক আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলে সন্তুষ্ট থাকেন– 'শ্রমিকদের মধ্যে যেতে হবে।' শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা

বৃদ্ধির জন্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের (কমিউনিস্টদের) অবশ্যই জনগণের সকল শ্রেণির মধ্যে যেতে হবে; তাদের অবশ্যই তাদের লড়াইয়ের বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট সব দিকে পাঠাতে হবে।' আশু দাবির ভিত্তিতে জনমানুষের আন্দোলন গড়ে তোলা তারই অন্যতম সোপান।

সেই লক্ষ্যে আমরা কিছু দাবি উত্থাপন করছি, যা ঐক্যমতে সংযোজন বিয়োজন সম্ভব।

- পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রাম জোর কর; শ্রেণি সংগ্রাম বেগবান করে মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হোন।
- সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন চাই (অর্থাৎ যে দল যত পার্সেন্ট ভোট পাবে সে অনুপাতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে)
- দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই (নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যরা কেউ নির্বাচন করতে পারবে না ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হবেন না।)
- সকল দল, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও বিশেষজ্ঞ নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ঐকমত্য ছাড়া গঠিত প্রতারণার নির্বাচন কমিশন গঠন আইন বাতিল করে নতুন আইন ও সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিধি বিধান করতে হবে।
- শিক্ষাকে বিজ্ঞানভিত্তিক, সর্বজনীন ও সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক একমুখী করতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-চিকিৎসাসেবা নিয়ে বাণিজ্য করা যাবে না।
- শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বিশ হাজার টাকা আইন করে বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য দূর করতে হবে।
- সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে। নারীদের গৃহস্থালী কাজের আর্থিক মূল্য জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- সারা দেশে উপজেলাসহ প্রধান প্রধান বাজারে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি দামে কৃষি পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রয়কেন্দ্র খুলতে হবে। কৃষি ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে হবে।
- দিনমজুর, খেতমজুর, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তদের জন্য গ্রাম শহরে সর্বজনীন পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

- ১৮৬১ সালের ব্রিটিশ বিধানে লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের পুলিশ আইন বদল করে পুলিশ বাহিনীকে আইনিভাবে নাগরিক সেবা-সুরক্ষার বাহিনীতে পরিণত করতে হবে।
- আমলাতন্ত্রকে শাসক দলের আজ্ঞাবহ কামলাতন্ত্রের বদলে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের গণসেবার কর্মচারী রূপে দাঁড় করতে হবে।
- যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্ব-শর্ত হলো নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে মতো প্রকাশের অধিকারকেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে এই কালো আইন বাতিল করতে হবে। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী, ৭০ অনুচ্ছেদ, বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে।
- এনকাউন্টারের নামে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা ও পুলিশি হেফাজতে হত্যা বন্ধের লক্ষ্যে দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে উপযুক্ত আইন করতে হবে।
- বিভিন্ন জাতি সত্ত্বার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভূমি সমস্যা সমাধানসহ ২৪ বছরের অনিষ্পন্ন পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উন্নয়নের অজুহাতে প্রকৃতি-পরিবেশ, জীববৈচিত্র ধ্বংস সাধন বন্ধ করতে হবে। পাহাড়-নদী, বন উজাড়, দখল-দূষণ রোধ করতে হবে।

আসুন, সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির মিলিত গণসংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হই, মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা ও গণআকাঙক্ষা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শহীদদের ঋণ শোধ করি ও অসম সাহসী সংগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই।

জয় সমাজতন্ত্র! জয় সর্বহারা জনতার জয়!
দুনিয়ার মজদুর এক হও!